প্রকাশক
সুবীর দাস
রত্না বুক এজেন্সী
৬১ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

অধ্যাপিকা অপর্ণা চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রচ্ছদশিল্পী : পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১ বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

মধুমঙ্গল পাঁজা
নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস
১৬ মার্কাস লেন
কলকাতা-৭০০০০৭

উৎসর্গ

আমার মা ৺ মায়াদেবী

এবং

আমার শ্বশুরমহাশয় ৺ অজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

—পরিমল চক্রবর্তী

"নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা তারা শোনো,
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ;
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের নির্দেশ প্রদানই ভূমিকার উদ্দেশ্য। কিন্তু গ্রন্থকার স্বয়ং ভূমিকা প্রদান না করে 'সবিনয় নিবেদন'-এ তার বক্তব্য নিবেদন করেছে। তাতে ভূমিকা রচয়িতার উদ্দেশ্য অনেকখানি সম্পন্ন হয়েছে। তবু একটু মুখবন্ধ প্রয়োজন বলে মনে করি।

আমাদের দেশের গ্রামগুলিতে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, এই সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতে তার চিহ্নমাত্রও নেই। এই দেশের পূজনীয় মনীষীরা অনেকেই মর্মে মর্মে সে কথা বুঝেছিলেন এবং তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা ও রচনার মাধ্যমে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

আমরা মনীষীদের ফটো বাঁধিয়ে ফুলের মালায় সাজিয়েছি ; কিন্তু তাঁদের কথায় তেমন কর্ণপাত করিনি। জনগণের প্রতি দরদ দেখিয়ে আমাদের অনেকে অনেক কুম্ভীরাশ্রু মোচন করেছেন। বিদেশী ভাষায় বিদেশী বুলি আউড়ে চীৎকার করেছি ; কিন্তু জাতির প্রাণকেন্দ্র গ্রামীণ জীবনের প্রতি এবং গ্রামের অর্থনৈতিক খনির সন্ধানে মনোযোগ দিইনি। আমরা সেই সব দেশের রাষ্ট্রীয় কর্মধারা অনুসরণ করেছি, যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশ আমাদের দেশে নেই। দেশের প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অনেকেই অকুণ্ঠিত ভাবে নির্দ্বিধায় বারবার ঘোষণা করেছেন যে, ভারতবর্ষে গ্রামই হল ভারতীয়দের জীবনকেন্দ্র এবং গ্রামোন্নয়ন দ্বারাই ভারতের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর।

আমার পুত্র শ্রীমান্ পরিমল চক্রবর্তী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উক্ত মনীষীদের কর্মধারা, চিন্তা প্রণালী ও রচনানুশীলন কর্মে ব্রতী হয়। সে শ্রমসাধ্য অধ্যবসায়ে মনীষীদের রচনাবলী অধ্যয়ন করে, তাঁদের কৃতকর্মের দৃষ্টান্তগুলি স্বচক্ষে দেখে এসে নিপুণ বিশ্লেষণে তাঁদের কর্মধারা ও চিন্তাধারা পর্যালোচনা করে গ্রন্থখানি রচনা করেছে। দীর্ঘদিন ব্যয়সাধ্য ও শ্রম-সাধ্য প্রচেষ্টায় শ্রীমান্ পরিমল একনিষ্ঠ সাধকের মতো অর্থনীতি শাস্ত্রের অনুশীলন করেছে, মনীষীদের রচনা সযত্ন সতর্কতায় পাঠ করেছে, অঞ্চল

বিশেষে ঘুরে ঘুরে গ্রামের অর্থনৈতিক বনেদগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে এবং মনীষীদের কর্মধারা বিশ্লেষণ করেছে।

এই গ্রন্থে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, মহাত্মা গান্ধী, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, কবি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি মনীষীদের রচনাধারা ও কর্মধারার মধ্যে যে গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প ছিল, গ্রন্থকার তথ্য ও যুক্তি সহকারে তা নিপুণ ভাবে প্রমাণিত করেছে। জীবনের অন্য ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও এবং নাগরিক জীবন যাপন করলেও যে এই মনীষীরা যথার্থ ভারতপ্রেমিক এবং গ্রামীণ সমৃদ্ধিকেই যে ভারতের সমৃদ্ধি রূপে উপলব্ধি করেছিলেন, তার প্রভূত প্রমাণ গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাণে এবং তার সামাজিক রূপায়ণে গ্রামীণ অর্থনীতির অবদান যে উপেক্ষণীয় নয়, গ্রন্থকার সযত্নে এবং নিঃসংশয়ে তা প্রদর্শন করেছে।

সাহিত্য চর্চায় আজীবন নিযুক্ত ছিলাম। কিন্তু বুঝেছিলাম যে, সাহিত্য অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সাহিত্যের জীবন চিত্রও অর্থনৈতিক জীবন। তাই আমার বিশ্বাস যে, বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের সমৃদ্ধি সাধনে গ্রামীণ অর্থনীতির অবদান উপেক্ষণীয় নয়। গ্রন্থখানি সর্ব-শ্রেণীর পাঠক সমাজেই সমাদৃত হবে বলে প্রত্যাশা করি।

সবিনয় নিবেদন

এই গ্রন্থখানি রচনার অন্তরালে আছে আমার গুরুদেব পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজজীর প্রেরণা। তাঁকে আমার অন্তরের অজস্র প্রণাম প্রথমে জানিয়ে বইটির বিষয়ে বলব কিছু কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। তাঁর প্রেরণায় মঠ-মিশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রচলিত গ্রামসেবার সঙ্গে সঠিক পল্লীসংগঠন সম্পর্কে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালের বীভৎস বন্যায় বিপর্যস্তদের প্রাথমিক ত্রাণের পর সামগ্রিক পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া তাঁরই চিন্তা-প্রসূত। আরামবাগ মহকুমার কিছু ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামকে কেন্দ্র করে পরীক্ষা-মূলক তাঁর গ্রামসংগঠনের পরিকল্পনার রূপদানের ইচ্ছার ফলস্বরূপ পাওয়া যায় "পল্লীমঙ্গল" কর্মসূচী। অন্ধ্রপ্রদেশের সাম্প্রতিক দারুণ ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ব্যক্তিদের ত্রাণ করার পর পুনর্বাসনের পরিকল্পনা হিসাবে গৃহীত "গ্রামশ্রী" পরিকল্পনার পেছনেও ছিল তাঁর প্রেরণা।

গ্রামের গরীব লোকদের কেবল আর্থিক স্বনির্ভরতার ব্যাপার নয়, তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও মানসিক সর্বাঙ্গীণ উন্নতির এক সামগ্রিক পরিকল্পনার কথাও ছিল স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর চিন্তার বিষয়। দেহা-বসানের কয়েক বছর পূর্বে অতি বৃদ্ধ বয়সেও বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে ঘুরে তিনি গ্রামবাসীদের সমস্ত খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতেন। ১৯৮০ সালের ২১শে এপ্রিল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ পরিচালিত গ্রাম সংগঠন প্রকল্পের অন্তর্গত ২৪ পরগণার গোবরডাঙা-লক্ষ্মীপুর অঞ্চল দেখতে যান তিনি। বৈশাখের দারুণ দাবদাহ অগ্রাহ্য করে তিনি সেখানে মাঠে মাঠে চাষীভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমে প্রস্তুত সোনার ফসলে ও পাতায় হাত দিয়ে হাসেন তৃপ্তির হাসি। গ্রামের গরীব লোকগুলির বুক ভরে যায় প্রচণ্ড প্রেরণায়।

আমরা বুঝেছি যে, গ্রামই ভারতের প্রাণ। গ্রামের উন্নতি ছাড়া ভারতের উন্নতি নেই। আমাদের বহু মনীষীরাও তাঁদের চিন্তা ও কর্ম দিয়ে এটা দেখিয়ে গেছেন। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়ঃ "বাঙ্গালীর মধ্যে যে শ্রেণীর লোকদের আমরা গুরু বলে মান্য করি, তাঁরা সকলেই প্রজার ব্যথায় ব্যথী এবং সে ব্যথা তারা কথায় প্রমাণ করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র···রবীন্দ্রনাথ সবাই প্রজার হয়ে ওকালতি করেছেন।"

শুধু বাঙ্গালী কেন, অবাঙ্গালী মনীষীরাও প্রজার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে, তাদের দুঃখ দূর করে গ্রামোন্নয়নের কথা চিন্তা করেছেন। তাঁরা অন্তরে অন্তরে আমাদের আর্থিক অবস্থা অনুভব করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন আমাদের ভূমি ও কৃষিদুর্গতির পরিণতি। অর্থনীতিবিদ্ বিমলচন্দ্র সিংহের নিজের কথায়ঃ "গ্রামের অবস্থা ক্ষয়িষ্ণু হতে আরম্ভ হল। যা কিছু কুটির শিল্প ছিল তা সব নষ্ট হয়ে সমস্ত লোক কৃষি নির্ভর হয়ে পড়ল। অন্তত ১৮২৫ সাল হতে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ পড়তে লাগল অত্যধিক।"

অবশ্য ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি আগের তুলনায় এখন অনেক অগ্রসর। অথচ বিভিন্ন মনীষীরা তাঁদের সেই সময়কার বহু বাধা বিঘ্ন ভেদ করে পথ প্রস্তুত করেছেন। আর সে পথ বেয়ে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে অনুগামীদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন চিন্তা ও চেষ্টার মাধ্যমে। অতএব এই অনুপ্রেরণা অবলম্বন করে আমাদের আরো অগ্রসর হতে হবে।

তাই গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গ্রহণ করা হচ্ছে নতুন গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প। ১৯৫১-৫২ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুর সময় থেকে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নতির জন্য চেষ্টা চলছে। এই আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে সমাজের পিছিয়ে পড়া পল্লীবাসীদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নতির জন্য ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর গ্রহণ করা হয় "সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প", যেটা মোটামুটি গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টারই নামান্তর। খোলা হচ্ছে বহু অঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, স্থাপিত হয়েছে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক।

আবার প্রথমে ১৯৭৫ সালে এবং অতি সম্প্রতি এই ১৯৮৬ সালের সংশোধিত বিশ-দফা কর্মসূচীতেও প্রাধান্য পেয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি। এইভাবে আমরা স্বাধীনতা-উত্তর কালে ক্রমশঃ গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারে বহুদূর এগিয়েছি। আমাদের গাঁ-ঘর বদলেছে বহু বটে। তথাপি প্রকল্প গ্রহণের অনুপাতে আশানুরূপ অগ্রগতির অভাব অস্বীকার করা যায় না। হয়ত সব কিছু সত্ত্বেও কোথাও থেকে যাচ্ছে কোন অন্তর্নিহিত আদর্শের অভাব।

সেইজন্য এখন এই ব্যাপারে বিভিন্ন মনীষীর আদর্শ ও কর্মধারা সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পারলে সত্যিকারের সাফল্যের চাবিকাঠি সহজেই আমাদের হাতে আসবে। এই কথা ভেবেই শরণাপন্ন হয়েছি আমাদের কয়েকজন মনীষীদের, যাঁরা চিন্তা করেছিলেন আমাদের এই গ্রামীণ অর্থ-নীতির কথা এবং গ্রামোন্নয়নের কার্যাবলী কিছু কিছু গ্রহণও করেছিলেন। আবার আমাদের মনীষীরা যে শুধু শহরেরই সম্পদ নয়, তাঁরা যে গ্রামের সাধারণ মানুষদেরও সমান সহমর্মী ছিলেন এবং অর্থবিজ্ঞানী না হয়েও গ্রামীণ অর্থনীতির সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সে কথা অনেকের কাছে আজও অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতা অবসানের আশাতেও আবশ্যক বোধ হয়েছে এই পুস্তক প্রণয়ন করা।

এখানে মোটামুটি বয়ঃক্রম অনুসারে আছে পরপর রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, মহাত্মা গান্ধী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলামের কথা। প্রত্যেকের জন্যই বরাদ্দ হয়েছে একটি করে অধ্যায়। শুধু রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর জন্য যথাক্রমে ছয় ও পাঁচটি অধ্যায় আছে। কারণ তাঁদের চিন্তা ও কর্ম এ ব্যাপারে বেশ ব্যাপক। এই মনীষীদের এইসব ভাবনা ও কর্ম নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বিশেষ বৃত্তিতে নিযুক্ত আছি গবেষণার কাজে। তাই তাঁর সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হল। আশাকরি আমরা আরো আলোর সন্ধান পাব এ সম্বন্ধে।

এই অধ্যায়গুলির অধিকাংশই আমার আর পাঁচটা লেখার মতো আনন্দবাজারের ভূমিলক্ষ্মী, ভাণ্ডার, ভারত বিচিত্রা, ধনধান্যে, বেতার জগৎ, যুবমানস, পশ্চিমবঙ্গ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আর্থিক প্রসঙ্গ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সময়ে। আবার কিছু আছে "আকাশবাণী"র কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বেতার-ভাষণের জন্য প্রস্তুত প্রবন্ধ। তাদের মধ্য থেকেই বিষয় বস্তুর মিল আছে, এমন কতকগুলি রচনা বেছে নিয়ে কিছু পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে পুস্তকাকারে পরিবেশিত হল এখানে। এজন্য পত্রিকাগুলির মাননীয় সম্পাদকবর্গ এবং "আকাশবাণী"র কলকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার পিতৃদেব স্বনামধন্য অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী, যিনি হাতে ধরে আমাকে বাংলা ভাষা লিখতে শিখিয়েছেন, তিনিই এই বইটির একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে এবং পুস্তকের পুরো প্রুফ দেখে দিয়ে আমার পিতৃঋণ আরো বাড়িয়ে দিলেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপকদ্বয় ডঃ দুর্গাদাস রায় ও ডঃ নির্মল দাস, যাঁরা এই পুস্তক প্রকাশের প্রসঙ্গ প্রথম তোলেন, তাঁদের জানাই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা। এর ওপর এই কাজে আমার ৯৪ বছরের বৃদ্ধা দিদিমা শ্রীমতী তরলাবালা দেবীর পরোক্ষ প্রেরণার কথা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন আমার পক্ষে। আবার আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা অপর্ণা চক্রবর্তী ও কন্যা শিবানী চক্রবর্তী এই বই লেখার জন্য অনবরত আমাকে অনুপ্রেরিত করেছে এবং পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের শ্রমের স্বীকৃতি না জানিয়ে পারলাম না।

এছাড়া এই সব রচনার ব্যাপারে বহু ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ, স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দ, স্বামী চিদানন্দ, স্বামী শান্তরূপানন্দ, অধ্যাপক অলক ঘোষ, অধ্যাপক রাখাল দত্ত, ডঃ করুণাময় মুখোপাধ্যায়, ডঃ মঞ্জুলা বসু, প্রণতি মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রিয়তোষ রায়, অধ্যাপক শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক নিত্যগোপাল

বসু, ডঃ পঞ্চানন সাহা, ডঃ রতনমোহন খাঁ, ডঃ সুব্রত গুপ্ত, অধ্যাপক অর্জুন দাস, অধ্যাপক দীপক গুপ্ত, অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ রায় মৌলিক, কবিতা সিংহ, সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ দীপঙ্কর কুণ্ডু, রূপকুমার বসু, নন্দলাল ভট্টাচার্য, সুশান্ত মিত্র, ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কিশলয় ঠাকুর, শান্তিকুমার মিত্র, ডঃ উমা দাশগুপ্ত, দীপালি ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অলক বন্দ্যোপাধ্যায়, তেজেন্দ্র রায়, বিমলেন্দু চক্রবর্তী, অনুপকুমার মাহিন্দার, ডঃ সুকুমার গুপ্ত, সহদেব সাহা, রঞ্জিত সাহা প্রভৃতি। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এই কাজে যেসব গ্রন্থাগারের সহায়তা পেয়েছি সে সবের মধ্যে ন্যাশনাল লাইব্রেরী, সিটি কলেজ লাইব্রেরী, স্টেট সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের কথাই বেশী করে মনে পড়ছে। এদের কর্মীদের জানাই প্রচুর প্রশংসা। ধন্যবাদ জানাই প্রচ্ছদশিল্পী পার্থপ্রতিম বিশ্বাসকে। প্রশংসা পাবার যোগ্য রত্না বুক এজেন্সীর মনতোষ দে এবং সুবীর ও প্রবীর দাস। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক শচীনন্দন ঘোষালকে। তাঁর মাধ্যমেই পরিচয় ঘটে এঁদের সঙ্গে। এঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বইটি প্রকাশ করার যাবতীয় দায়িত্ব নেন।

আমার আত্মীয় চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও সুবীর চক্রবর্তীর মতো প্রচুর পুস্তক-প্রেমীদের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য এই প্রকাশনার কাজে প্রয়াস পেয়েছি। এই ভাবে সকল শ্রেণীর পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে এখন এই সব মনীষীদের ধ্যান-ধারণা ও কর্মের আদর্শ আমাদের সকলকে, বিশেষ করে যুব সমাজকে, যদি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিনটিকে "জাতীয় যুব দিবস" হিসাবে পালন করার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ১২৫ তম জন্ম-জয়ন্তীর কথা স্মরণ করে, গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে, তবেই আমার এই শ্রম সার্থক।

আর একটি কথা হল যে, "প্রয়োজনীয় পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা" নামে একটা আলাদা অধ্যায় হিসেবে বইপত্রের তালিকা দেওয়া হল। যাঁরা এইরকম কোন বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে আরো গভীর গবেষণা করতে আগ্রহী, আশাকরি তাঁরা কিছুটা উপকৃত হবেন। এভাবে তাঁদের বিন্দুমাত্র উপকারে লাগলেও নিজেকে ধন্য মনে করব।

সবশেষে, সবিনয় নিবেদন এই যে, যথেষ্ট যত্ন নেওয়া সত্বেও নিশ্চয় কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। আশাকরি বিবেচক পাঠকবর্গ নিজগুণে তা ক্ষমা করে নেবেন।

সূচীপত্র

॥ এক ॥

রামমোহন ও ভারতের কৃষি-অর্থনীতি

"...the condition of the cultivators is very miserable In an abundant season, when the price of corn is low, the sale of their whole crops is required to meet the demands of the landholder leaving little or nothing for seed or subsistence to the labourer or his family."

—**Raja Rammohan Roy**

ভারতবর্ষ যখন কুসংস্কারের অন্ধকারে ঢাকা, সমাজের চতুর্দিক যখন নানাপ্রকার ধর্মান্ধতার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন তেমনি এক সঙ্কটময় মুহূর্তে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাঙালি সমাজের সংস্কারের কাজে ভারতীয় সমাজমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন রাজা রামমোহন রায়। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলেই মনে পড়ে সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন সুপুরুষের বিশাল দেহখানি। তাঁর ভেতরে ছিল তেমনি আবার এক প্রচণ্ড উদ্যমশীল মন যার মাধ্যমে তিনি সমাজে নারী জাতির এক বিরাট সমস্যা দূর করলেন। সতীদাহ প্রথা, বহু বিবাহ প্রথা এবং জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি ভীষণভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন। আবার শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর দান অপরিসীম। আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। আইন সংক্রান্ত তাঁর বহু লেখা আমরা দেখে বিস্মিত হই। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কেও তিনি বহু লেখালেখি করেছেন।

রাজা রামমোহন রায় যদিও একজন মহান সমাজ-সংস্কারক হিসেবে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠেন তবুও অর্থনৈতিক অবস্থা যখন সমাজ-ব্যবস্থার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক তখন তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থাও, বিশেষতঃ কৃষি-অর্থনীতি রাজা রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কার প্রয়াসী চিন্তাধারাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। ভারতবর্ষ তো কৃষি প্রধান দেশ।

তাই কৃষির সমস্যাই এদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সুতরাং ভারতীয় কৃষি জগতের, বিশেষত: ভূমিস্বত্ব, ভূমিরাজস্ব এবং ভূমিসংস্কার জাতীয় সমস্যা সমধানের দিকেই রামমোহনের চিন্তাধারাকে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। তাঁর রচনায় যদিও সরকারি আয়-ব্যয়, আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি সম্পর্কে নানারকম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় তথাপি তাঁর আলোচনার প্রধান বিষয়ই ছিল কৃষি-ভূমি সমস্যা।

রামমোহনের মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল যে অর্থনৈতিক পটভূমিকার ওপর ভিত্তি করে তার সর্বপ্রধান দিকই হল কৃষিব্যবস্থা ও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত সমস্যা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূমি রাজস্ব বিভাগে বছর দশেক কাজ করে তিনি এ সম্পর্কে দীর্ঘতম অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ সম্বন্ধে তঁরা প্রায় সমস্ত লেখাই ১৮৩১ সালের আগষ্ট মাস থেকে ১৮৩২ সালের জুলাই মাসের মধ্যে রচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তদের দুর্দশার ছবি রামমোহন এঁকেছেন। তখন জমিদাররা প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধির ব্যাপারে উঠে পড়ে লেগেছিলেন এবং ১৭৯৩ সালের পূর্বে কৃষকদের যে সমস্ত অধিকার সর্বত্র মানা হত সে-সব খর্ব করেছিলেন। রায়তদের খাজনা প্রদানের বিলম্বের শাস্তিস্বরূপ কিরূপে তাদের সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হত তার সকরুণ বর্ণনা দিয়েছেন রামমোহন।

জমিদাররা চাষীদের উৎপাদিত ফসলের দামের শতকরা ৫০ ভাগ নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করায় বাকি ৫০ ভাগ থেকে বীজ ও কৃষির অন্যান্য সমস্ত ব্যয় বহন করে কিভাবে তাদের জবীনযাত্রার সম্বল খুঁজতে হত তার সকরুণ চিত্র রামমোহন তুলে ধরেছেন বিশেষভাবে। তিনি দেখিয়েছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হয়েছিল যে সব আশা নিয়ে তার মধ্যে রাজস্ব সম্বন্ধে জমিদার ও সরকারকে নিশ্চিতকরণ ছাড়া আর সবই প্রায় কিছু দিনের মধ্যে বিফল হয়েছিল। কৃষির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন যতটুকু হয়েছিল তার কৃতিত্ব জমিদারের ছিল না। অথচ তা থেকে লাভের পুরোমাত্রাই জমিদারের ভোগে এসেছিল এবং কৃষক ছিল বঞ্চিত।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির মালিকদের অবস্থার যে উন্নতি হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু সরকারী মতে এতে রাজস্বের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। এ ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়ের মন্তব্য শোনা যাক্‌: "The amount of assessment fixed on the lands...was as high as had ever been realised... Therefore, the Govt. sacrificed nothing in concluding that settlement. If it had not been informed the landholders (Zaminders) would always have taken care to prevent the revenue from increasing by not bringing the waste lands into cultivation, and by collusive arrangements to elude further demands ;"

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁর মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের ত সুবিধা হয়েছেই, তা নাহলে তারা রাজস্ববৃদ্ধিতে নানারকমভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করত। আর সরকারেরও যখন কিছু ত্যাগ স্বীকার না করে উঁচু হারেই কর নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে তখন সরকারী রাজস্বের দিক থেকেও এই ব্যবস্থা লাভজনক হয়েছে।

এইভাবে আমরা দেখি যে, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদাররা যখন খুব সুবিধা পেয়ে গেল কিন্তু দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না তখন রাজা রামমোহন রায় এই গরীব চাষীভাই-দের রক্ষাকার্যে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন এবং পুনরায় খাজনা বৃদ্ধি রোধ করার কথা বললেন খুব কঠোর ভাষায়: "আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনা, —কেন ভবিষ্যতে খাজনা-বৃদ্ধি শক্ত-হাতে নিষিদ্ধ করা হবে না।"

প্রতিটি কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের একটা সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের কথা রামমোহন বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। আবার জমিদারের কাছ থেকেও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ হ্রাস করার প্রস্তাব তিনি করেন, কেননা এর ফলে জমিদারেরা রায়তদের অর্থাৎ কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা গ্রহণের হার কমিয়ে দিতে পারবে। অবশ্য সরকারী রাজস্বের

এই হ্রাস পূরণের বিকল্প উপায় হিসেবে তিনি বলেন যে, বিলাসদ্রব্যের ওপর কর চাপিয়ে বা বেশি বেতনের ইউরোপীয়দের স্থলে কম মাইনের ভারতীয়দের কালেকটরের পদে নিযুক্ত করলে একটা সুরাহা হতে পারে।

১৮২৮ সালে প্রত্যেক জেলায় রাজস্ব আদায়কারীর করমুক্ত জমির মালিকদের জমির অধিকারচ্যুত করার ক্ষমতার নানাপ্রকার জটিলতা নিয়ে যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জনগণের মধ্যে গণ্ডগোল ও অসন্তোষের ইঙ্গিত পাওয়া গেল তখন রাজা রামমোহন রায় সেই আন্দোলনকে জোরালোভাবে তুলে ধরলেন তাঁর "Petition to the Governor-General Lord Bentinck against Regulation III of 1828" নামক প্রবন্ধে।

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রতিবছর ৪৫ কোটি টাকারও বেশি ভারতীয় অর্থ বিদেশে চলে যেত। রাজা রামমোহন রায়ের দৃষ্টি সেইদিকেও যথেষ্ট আকর্ষিত হয়েছিল। ভারতীয় টাকাপয়সার এই শোচনীয় বহির্গমনের ধারাকে প্রমাণ করার জন্য তিনি বহু তথ্যের তালিকা রচনা করেন এবং লেখেন: "It appears that the proportion of the Indian revenues expended in England on the territorial account amounts, on an average, £ 3,000,000 annually——" তাই এই বেদনাদায়ক অবস্থার নিবৃত্তিকল্পে তিনি এমন এক ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন যাতে ইউরোপীয়ানরা ভারতীয় অর্থ নিজ দেশে নিয়ে গিয়ে খরচা না করে ভারতীয় অর্থনীতিতেই ব্যয় করে নূতন নূতন উন্নত ধরনের কৃষিপদ্ধতির সঙ্গে তৎকালীন জমিদার ও চাষীভাইদের পরিচিত করাতে পারে।

যুগপ্রয়োজনে আজ রাজা রামমোহন রায়ের এই সমস্ত ধ্যান-ধারণা কিছুটা বিতর্কিত এবং গুরুত্বহীন হলেও তৎকালীন কৃষি-ভারতের অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনে তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম এবং ভারতের কৃষি অর্থনীতির আলোচনাকে একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী রূপ দান করার ব্যাপারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর পূর্বে আমাদের দেশের কোন পণ্ডিত

ব্যক্তি ভারতের কৃষি-অর্থনীতির সমস্যা নিয়ে তেমন কোন কিছু সুসম্বদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন বলে শোনা যায় না। বাস্তবিক-পক্ষে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির বিশ্লেষণ ও তথ্যানুসন্ধানের যে দ্বারোদ্ঘাটন তিনি করেছিলেন সেখান দিয়ে তাঁর উত্তরসূরীরা প্রবেশ করেন তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৪০ বছর পরে।

অতএব আসুন আজ আমরা আমাদের পথ প্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়কে রবি-কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে নমস্কার জানিয়ে শক্তি প্রার্থনা করি :

"হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
মৃত্যু অন্তরাল ভেদি' দাও তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক্ উদ্বোধন, এনে দিক্ শক্তি অভিনব।"

॥ দুই ॥

বঙ্কিম-দৃষ্টিতে বাংলার কৃষক

"আমাদের উন্নতির রোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ।"

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

না, বাঁকা চোখে দেখা নয়। একান্তই সোজা চোখে দেখা। খুবই সহজ সরল ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা এবং দৃষ্টিটা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বলেই এই নামকরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের "সাম্য" নামে বইটি পড়লে তাঁর প্রগতিশীল ভাবধারার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এতে তিনি শ্রেণী-বৈষম্য ও আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায়ঃ "সর্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও কখনও দুই একজন লোকে টাকার খরচ খুঁজিয়া পান না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে।" এই ধারণার বশবর্তী হয়েই বঙ্কিমবাবু তাঁর "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় বহু প্রবন্ধে, যেগুলির কয়েকটি পরে "বঙ্গদেশের কৃষক" নামে বই হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে, বাংলার কৃষকের জন্য অনেক চোখের জল ফেলেছেন এবং কৃষক সমস্যার প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

তিনি যে কত স্পষ্ট এবং সহানুভূতির দৃষ্টিতে বাংলার কৃষকদের দেখেছিলেন তা পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁর অনবদ্য ভাষার রঙে আঁকা তাদের সকরুণ ছবি থেকেঃ "হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায় খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম-বিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে……উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে,

তাহার নিবারণ জন্য অঙ্গুলি করিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে। ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে কিন্তু এখন বাড়ি গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাতুরে না হয় ভূমে গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পর দিন প্রাতে আবার সেই একহাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে। যাইবার, সময় হয় জমিদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না।"

বঙ্কিম তাঁর দৃঢ় লেখনীর সাহায্যে সকলকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, যেহেতু দেশের বেশির ভাগ মানুষই কৃষিজীবী এবং তারাই রয়েছে দেশের শ্রীবৃদ্ধির মূলে সেহেতু তাদের মঙ্গল সাধন না করতে পারলে দেশেরও মঙ্গল নেই। এটা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে অহরহ প্রজার হিতার্থ চিন্তা করে গেছেন। তাঁর ভাষায়: "বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈষী এবং প্রজার হিতকামনা আমরা কখনও ত্যাগ করিব না।" ইতিহাসে অনন্ত মাহাত্ম্য ও উন্নততর সভ্যতা লাভের প্রলোভন দেখিয়ে তিনি ইংরাজদের কাছেও প্রার্থনা করেছেন: "যদি তাঁহারা কুচরিত্র জমিদার গণকে শাসিত করিতে পারেন তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে তজ্জন্য তাহাদিগের মাহাত্ম্য অনন্তকাল পর্যন্ত ইতিহাসে কীর্তিত হইবে এবং তাহাদিগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে।"

বাংলার তথা ভারতের সমস্ত শ্রমোপজীবীর, বিশেষতঃ কৃষকের দুর্দশা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র এত ব্যথিত হয়েছিলেন যে তাহাদের চিরদারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধানেরও চেষ্টা তিনি করেছেন এবং তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায়ও বাৎলে দিয়েছেন। তিনি বুঝেছেন যদি ধনবৃদ্ধি অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বেশি হয় তবেই দেখা দেয় এই দুর্দশা। তাই এর প্রকৃত সদুপায় হিসাবে তিনি ধনবৃদ্ধির কথা বলেন। কিন্তু তাতে অনেক বিঘ্ন আছে বলে যেমন, উপায়ান্তরের কথাও অর্থাৎ লোকসংখ্যা হ্রাসের কথাও বলেন, আবার প্রথমত: দেশীয় লোকের কিছু অংশের দেশান্তরে যাওয়া, দ্বিতীয়তঃ বিবাহ প্রবৃত্তির দমন।

কৃষকদের বঞ্চনার রূপটি তিনি তাঁর কঠিন প্রশ্নবাণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন : "এই ঈশ্বর প্রেরিত কৃষি ধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক পায়েন, মহাজন পায়েন—কৃষী কি পায় ? যে এই সকল ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পায় ?" এবং এর পরিণামও যে খুব ভয়ঙ্কর তার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন : "হিসাব করিলে তাহারাই দেশ। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।...সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে ?" বঙ্কিমের এই প্রশ্নবাণে আমরা একটা বিপ্লবের গন্ধ পাই। আর সত্যিই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষক বিদ্রোহের ভয়ে যথেষ্ট ভীতও হয়েছিলেন। "আনন্দ মঠ"-এর বিদ্রোহের এক অস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখেছিলেন : "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরবর্তী বৎসরগুলিতে অনশনক্লিষ্ট কৃষকগণের যোগদানের ফলে তাহাদের (অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের) দল ভারী হইয়া উঠে। এই কৃষকদের না ছিল চাষের বীজ, না ছিল কোন যন্ত্রপাতি।"

বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর সমসাময়িক কালের কৃষক সংগ্রামের সমাজ-বিপ্লবের আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পরেছিলেন তা একেবারে অমূলক ছিল না। ভারতের বড়লাট লর্ড লিটনের (১৮৭৬-৮০) কৃষিসচিব ও কংগ্রেসের তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অক্‌টাভিয়ান হিউম ভারতের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে লিখেছিলেন : "দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে সকল সংবাদ আসিয়া পৌঁছিতে ছিল তাহাতে ·· আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, আমরা একটা ভয়ঙ্কর অভ্যুত্থানের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।·· এই সকল সংবাদের বেশীর ভাগ দেশের মানুষের নিম্নতম অংশের (কৃষকের) সম্বন্ধে।" দেশের এই ভয়ংকর বৈপ্লবিক অবস্থা ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না।

কৃষক বিদ্রোহের মূল কারণও বঙ্কিমচন্দ্র অনুসন্ধান করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে, ইংরাজকৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ। ১৮৭২ সালে তিনি তাঁর "বঙ্গদর্শন"-এ লিখলেন : "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র। কস্মিন

কালে ফিরিবে না।” সুতরাং এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী প্রথা যে বাংলার কৃষকের, সমগ্র দেশের সর্বনাশের মূল সে সম্পর্কে বঙ্কিমবাবুর কোন সন্দেহ ছিল না। এমনকি তিনি একথাও জানতেন যে, “জমিদার চিরকালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরেজরা প্রথমে সে দস্যুবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করিলেন।”

বঙ্কিমচন্দ্রকে নীলকর দমনে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে হয়েছিল। যখন দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” নামে নাটক প্রকাশিত হয় ও প্রকাশক পাদরী লঙের বিরুদ্ধে মামলা চলে তখন বঙ্কিমবাবু খুলনায় বদলি হয়ে চলে এসেছেন। সেই সময় মরেল ও অন্যান্য নীলকরদের অত্যাচার দমন করতে তাঁকে প্রভূত শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে নিস্তার নেই বুঝেই মরেল, তার অংশীদার লাইট ফুট ও হিলি সবাইকেই তাদের রাজ্য ছেড়ে পালাতে হল। বঙ্কিমবাবুর মাথার জন্য যে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল তা খুলনাবাসীরা সবাই জানত। কিন্তু তিনি এমন শোধ নিয়েছিলেন যে, মরেলগঞ্জকে শান্তমূর্তি ধারণ করতে হয়েছিল। মরেল-গঞ্জের ঘটনা ও মরেল দমন বঙ্কিমবাবুর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার কৃষকদের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন এখন ঠিক তেমনটি আর নেই। জমিদার, মহাজন প্রভৃতির সে অত্যাচারও প্রায় বন্ধ। উন্নত চাষাবাদের দৌলতে কৃষকদের অবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে। তথাপি বঙ্কিমবাবু কৃষকদের ওপর যেসব উৎপাতের কথা লিখেছেন এবং তাদের দুরবস্থার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার অধিকাংশই এখনও গ্রাম বাংলার বহুক্ষেত্রে অন্যরূপে ভিন্ন ঢঙে রয়ে গেছে। পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়নি। অতএব আজ যখন আমরা কৃষি ও কৃষকদের দিকে নতুন করে মুখ ফিরিয়েছি তাদের উন্নতির চেষ্টায় তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাদের কি দৃষ্টিতে দেখে কেমন করে তাদের হিতার্থে শক্ত হাতে লেখনী ধরেছিলেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এ সমস্তই একটু ঝালিয়ে নিলে আমরা আরো অনেক বেশী প্রেরণা নিয়ে এগোতে পারব।

॥ তিন ॥

গ্রামোন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরণ কোমলমূর্তি মর্মে গাঁথা॥"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। তবুও তাঁর এমন কিছু রচনা ও কর্মের পরিচয় আমরা পাই যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি গ্রামীণ অর্থনীতি সম্বন্ধে খুব মাথা ঘামিয়েছেন এবং তার উন্নতি বিধানে কিছু কিছু ব্যবস্থা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং অপরেও কিভাবে করতে পারে তারও পথনির্দেশ করেছেন। তাই জমিদার রবীন্দ্রনাথ বা শান্তিনিকেতন—শ্রীনিকেতনের উদ্যোক্তা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কবিগুরু বা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথাই আমাদের বেশি করে মনে হলেও এখানে তাঁর সেই গ্রাম-চেতনার কথাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কবি হলেও রবীন্দ্রনাথ সজাগ বাস্তব বুদ্ধিতে বহুপূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, গ্রামই ভারতের প্রাণ। এর উন্নতি ছাড়া ভারতের উন্নতি অসম্ভব। তাঁর কথায়ঃ "মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই; এইখানেই প্রাণের নিকেতন; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।" অথচ এই গ্রামের দীনতা দেখে দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছে। তিনি লিখেছেনঃ "আজ পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, পথ দুর্গম, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজবন্ধন শিথিল, ঈর্ষাকলহ কদাচার লোকালয়ের জীর্ণতাকে প্রতিমুহূর্তে জীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে।" তাই তিনি চিৎকার করে বলেছেনঃ
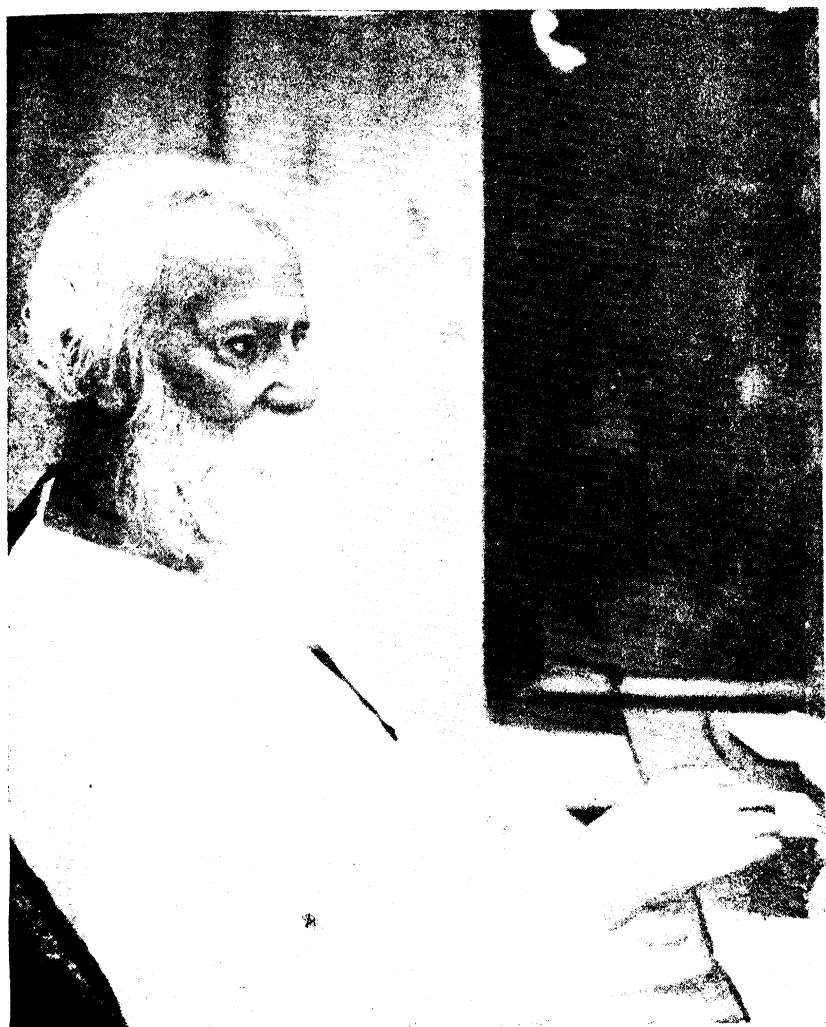
"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি॥"

অতএব "ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, সেবা দ্বারা, পরস্পর মৈত্রীবন্ধন দ্বারা, বিক্ষিপ্ত শক্তির একত্র সমবায়ের দ্বারা ভারতবাসীর বহুদিন সঞ্চিত মূঢ়তা ও ঔদাসীন্যজনিত অপরাধরাশির সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট দেবতার অভিশাপকে" তিরস্কার করার কথা তিনি বার বার বলেছেন। এইভাবে আসল ভারতবর্ষের রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য কর্মীদের ডাক দিয়ে তিনি বলেন: "সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গানবাজনা কীর্তন পাঠ চলবে, ...তোমরা কেবল ক'খানা গ্রামকে এই ভাবে তৈরী করে দাও। আমি বলব, এই ক'খানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ।"

রবীন্দ্রনাথ রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মালেও ১৮৭৫ সালে তিনি সর্বপ্রথম যে বিরাহিমপুর পরগণার খোরশেদপুরের (শিলাইদহের) গ্রামীণ পরিবেশে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তার সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন যখন ১৮৯০ সালে জমিদারির নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু করলেন পদ্মাপারে শিলাইদহের পল্লীভূমিতে। অবশ্য তাঁর কাজকর্মের সম্পর্ক পরে বেশি ছিল কালীগ্রাম পরগণার সাথে। ওখানকার সদর কাছারি পতিসরকে কেন্দ্র করে তিনি গ্রামোন্নয়নের সর্বপ্রকার পরীক্ষা করেছেন। শেষকালে অবশ্য নানারূপ প্রতিকূলতা ও পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে তিনি বীরভূমের পল্লীতে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন নিয়ে নতুনভাবে কাজে নামেন। এতে নিজ জমিদারিতে যেমন অভিনবত্ব ছিল ততটা না থাকলেও মোটামুটি কাজ কিছুটা এগিয়েছিলেন।

শ্রীনিকেতনের মূল লক্ষ্যের দিকে রবীন্দ্রনাথের যে কতখানি নজর ছিল তার এক উজ্জ্বল নজির মেলে কবিরই কাছের এক মানুষ সুধীরচন্দ্র করের কথায়: "একবার গুরুদেব শ্রীনিকেতনে সভা ডেকেছেন। কুঠির দোতলায় জড়ো হয়েছেন বিশিষ্ট কর্মীরা। গুরুদেব নীরব। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বসেই আছেন ; সবই লক্ষ্য করছেন। অবশেষে সচিব তাঁকে সভার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তারা কোথায়? সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে—কারা? কবি বললেন, গ্রামের লোকদের চাই। আমি কি বাবুদের জন্য শ্রীনিকেতন করেছি? তৎক্ষণাৎ ছুটাছুটি লাগল। কারখানা, কৃষিবিভাগ ও শিক্ষাসত্র থেকে সকলের ডাক পড়ল সবাই জড়ো হল। তখন তিনি গ্রামের শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে জুড়লেন নানা আলাপ নানা আলোচনা।"

এইভাবে পল্লীসংগঠনের বহু পরিকল্পনা শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হওয়ায় এলম্‌হার্স্ট সাহেব ও কালীমোহন ঘোষ তার দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের নিজপুত্র রথীন্দ্রনাথতো আছেনই। আবার কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ছেলে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারেরও ভূমিকা কম নয়। নিজপুত্র ও বন্ধুপুত্র উভয়কেই ইলিনয় ইউনিভার্সিটি থেকে কৃষিবিদ্যা পড়িয়ে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লণ্ডনে থাকাকালীন সুরুলের সিংহ পরিবারের কাছ থেকে কুঠিবাড়ীটি কেনেন এই আশায় যে, নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঐখানেই বাগানে তাঁর সাধনায় মগ্ন হবে এবং বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র লিপ্ত হবে ১০০ বিঘা জমিতে গরু-মোষ রক্ষণাবেক্ষণ ও দুধ সরবরাহের কাজে।

চাষের চেয়ে গরুর ব্যবসাকে অনেক লাভজনক এবং এটাকে বাংলার একটা আদর্শ স্বাধীন ব্যবসা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বলেই সন্তোষ মজুমদারকে সর্বদা এতে উৎসাহিত করতেন। আর নিজের ছেলে রথীর সঙ্গে তাঁকে একত্রে কাজ করাবার জন্য কবির কী আগ্রহ: "রথীর সঙ্গে বরাবর তোমার কাজের ও জীবনের যোগ থেকে যায় এটা আমার পক্ষে একটা আনন্দের বিষয়।...রথীকে তোমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হব সে প্রলোভনেই আমি নিতান্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এই একটি কীর্তি করে বসে আছি।" সন্তোষচন্দ্র মজুমদারও কিন্তু কবিগুরুর এই বাসনাকে জীবনের মূল মন্ত্র মনে করে কজ্জে করে গেছেন। অবশ্য অকালেই নিয়তির নিঠুর নিয়ম নিয়ে

গেছে তাঁকে মৃত্যুর কোলে। তাই তাঁর পক্ষে বেশী দিন কাজ করা সম্ভব হয়নি। তবুও যা করে গেছেন তার তুলনা হয় না। তাই এই সুযোগে তাঁর এই শতবার্ষিকী সূত্রে স্মরণ করি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, গ্রামে কাজ করতে হয় সেখানে থেকে এবং সাথে সাথে শিক্ষা লাভও করতে হবে। তিনি নিজেও কিন্তু পল্লীতে থেকে পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৯৩৮ সালের এক বক্তৃতায় তিনি বলেন: "কর্ম উপলক্ষে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণদেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষ্য-গোচর হয়েছে।" তাঁকে আরো বলতে শোনা যায়: "প্রত্যেকে আমার কাছে তাদের সুখ দুঃখ নালিশ আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীছবি আমি দেখেছি। একদিকে বাইরের ছবি নদী প্রান্তর ধানক্ষেত ছায়াতরুতল, তাদের কুটির, আর একদিকে তাদের অন্তরের কথা।"

এই রকম করে কাজে নামবার আগে তিনি পল্লী জননীর এবং তাঁর দুঃখী সন্তানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হয়ে নিতে চেয়েছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন: "যতদিন পল্লী গ্রামে ছিলেম, ততদিন তাকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে। শিলাইদহ থেকে পতিসর, নদীনালা বিলের মধ্যে দিয়ে তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য তাদের জীবন যাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে। মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলাম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্য কিছু করব এই আকাংক্ষায় আমার, মন ছটফট করে উঠেছিল।"

বর্তমানে আদর্শ স্বচ্ছল গ্রামীণ অর্থনীতি বলতে আমরা বুঝি গাঁয়ের মাঠে সম্বৎসর সেচ সংস্থান, বিদ্যুৎসংযোগ, মহাজনের বদলে ব্যাঙ্ক বা সমবায় সমিতির মাধ্যমে সহজ সুলভ ঋণ, পল্লীশিল্পের উদ্যোগ, গ্রামের লোকের

ব্যবস্থা, শিক্ষা বছর ভরকাজ, চাষাবাদে নবপদ্ধতি প্রচলন, ভালো সড়ক, পানীয় জলের ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মপথে এর প্রায় সবকিছু দিকেই আলোকপাত করেছেন। "পল্লী প্রকৃতি" নামক বইতে তাঁকে লিখতে দেখি : "আজ শুধু একলা চাষীর কাজ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে।"

বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি কাজ প্রচলনের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালে নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে এবং ১৯০৭ সালে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে বিদেশে পাঠান চাষবাস শিখতে। ১৯০৮ সালে কালীমোহন ঘোষ গ্রামের কাজে যোগ দেন। আর ১৯০৯ সালে রথীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিদেশ থেকে ফিরে লেগে গেলেন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, সার, পাম্প ইত্যাদির ব্যবহার করতে। কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ৮০ বিঘা জমিতে শুরু হয় সেই গবেষণা। তারপর ১৯১০ সালে ট্রাকটর, সার, পাম্পসেট ইত্যাদি দিয়ে শুরু হয় অধিক ফলনশীল আমেরিকান ভুট্টা, আখ, টমেটো, আলু প্রভৃতির চাষ। সস্তায় নৌকাবোঝাই ইলিশ মাছ কিনে চুণ দিয়ে মাটিতে পুঁতে সার তৈরী করা হয়। পতিসরে নাকি স্বয়ং রথীন্দ্রনাথকেই ট্রাকটর চালাতে দেখা গেছে। ক্রমে চাষীদের মধ্যে ট্রাকটর ব্যবহারে উৎসাহের অন্ত ছিল না।

জমিকে দু'তিন ফসলা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমে কবি নাট্যকার ও কৃষি বিশারদ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে আলু চাষ আরম্ভ করেন। তাতে লোকসান খেতে হয়েছিল বটে তবু তিনি আশা করেছিলেন এর প্রচলন লাভের হতে পারে। তাছাড়া প্রত্যেকের বাড়ি, ক্ষেত্রের আল, বেড়া প্রভৃতি স্থানে কলা, ভুট্টা, কপি, পাটনাই মটর, আনারস, খেজুর, শিমুল, আঙ্গুর ইত্যাদি গাছ লাগাতে উৎসাহিত করতেন। "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" বইতে তিনি লেখেন : "শিলইদহে কুঠি বাড়ির চারদিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নূতন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলাম···আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্ব প্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি।"

কখন কোন ফসল চাষ করতে হবে, তার প্রকরণ ও সার কি কি এসব সম্বন্ধে সারকুলার বিলি করতে হত। হাতে কলমে কৃষিশিক্ষা, আদর্শ গ্রাম তৈরি ও ব্রতী বালক গঠন এসবেরও ব্যবস্থা ছিল। আখ মাড়াই কলও স্থাপিত হয়েছিল কুষ্টিয়ায়। চাষীদের ধান, পাট কিনে বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল ১৮৯৫ সালে কুষ্টিয়ায় স্থাপিত "টেগোর এণ্ড কোং"-এর মাধ্যমে। অর্থাৎ কৃষিপণ্য বিপণনের দিকটিও তাঁর নজর এড়ায়নি।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারির আয়ও বাড়িয়েছিলেন এবং বাড়তি টাকার অধিকাংশই চাষ ও চাষীর কল্যাণে ব্যয় করেছেন। জমিদার ও গ্রামবাসীদের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরী হল প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুল, ছাত্রাবাস, মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নাকি চিকিৎসা করতেন মাঝে মাঝে। পতিসরে বড় হাসপাতাল হয়। সমগ্র ভারতে সর্বপ্রথম তিনিই স্বাস্থ্য-সমবায় করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কুটির-শিল্প উন্নয়নের প্রয়াসে বয়নশিল্প শেখানোর জন্য শ্রীরামপুরে নেওয়া হয় একজন তাঁতিকে, স্থানীয় এক মুসলমান জোলাকে তাঁতের কাজ শিখতে পাঠানো হল। শান্তি-নিকেতনে খোলা হল তাঁতের স্কুল. পটারির কাজেও হাত দেওয়া হয়। কুষ্টিয়া থেকে শিলাইদহ পর্যন্ত ছ'মাইল রাস্তা বনিয়ে দেন তিনি। অবশ্য মেরামতির দায়িত্ব দেওয়া হয় স্থানীয় গ্রামবাসীদের ওপরে। আরো ছোট-খাটো কিছু রাস্তা এবং এস্টেট থেকে পতিসর-আত্রাই ষ্টেশন পর্যন্ত সাত মাইল রাস্তা তৈরী করে দেওয়া হয়। কুঁয়ো খোঁড়ার দায়িত্ব গ্রামবাসীদের দিয়ে তিনি নিজে তা বাঁধিয়ে দেবার দায়িত্ব নেন। পুকুর সংস্কারও এভাবে হয়। পতিসরে একটা ধর্মগোলাও বসনো হয়।

রবীন্দ্রনাথ সর্বদা প্রজাদের স্বাবলম্বী করতে এবং আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন যাতে তারা ভূমিলক্ষ্মীর সাধনায় শেষপর্যন্ত সিদ্ধিলাভ করতে পারে। গ্রামোন্নয়নের ভিত্তি স্বরূপ তিনি সর্বদাই প্রজাদের উপদেশ দিতেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে, যাতে তাঁরা উদ্যম নিয়ে নিজের মনের মতো করে নিজেদের গ্রামকে সাজাতে শেখে। তাঁর এক চিঠি থেকে আমরা জানতে পাই : "যাতে গ্রামের লোক নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে,

পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিশে বিচার বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায়, সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়, তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।" শেষবারের মত যখন তিনি পতিসরে যান তখনও অভিনন্দনের উত্তরে প্রজাদের বলেছিলেন: "তোমাদের উন্নতির জন্য কিছু করবার ইচ্ছা থাকলেও আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও, তোমাদের সবার মঙ্গল হোক।"

জমিদার বা মহাজন কর্তৃক গরীব গ্রামবাসীদের যে শোষণ তা রবীন্দ্রনাথের বুকে বড় বেদনার মত বেজেছিল। তাই তিনি জমিদারীর কাজে এসেই চাষীভাইদের সঙ্গে পাতালেন অকৃত্রিম আত্মীয়তা। অনেক অভিযোগ, অপূর্ণতা ও নিন্দার কথা কওয়া হলেও এবং তিনি তা বিনয়ের সঙ্গে মেনে নিলেও আমরা বলব যে, তাঁর জীবন ও কাব্য উভয়েরই পট পরিবর্তন হয়েছে। তা না হলে তিনি বলবেন কেন:

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখোনা বসায়ে আর। দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে।"

সেইজন্যেই কাব্যে ও কাজে অনেকখানি সম্ভব হল এখন তাঁর পক্ষে প্রবেশ করা সেখানে যেখানে:

"চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।"

তাই এভাবে "কৃষাণের জীবনের শরিক" হয়ে কড়া নজর রাখতে থাকলেন আমলা মহাজন ও জোতদারদের ওপর। আর যতটা পারেননি নিজে, সে ফাঁক পূরণে আহ্বান করেছেন আগামীকালের মানুষদের।

জমিদারীর সমস্ত অঞ্চল দু'বছর ধরে ঘুরে রবীন্দ্রনাথ বেশ বুঝেছিলেন যে, আমলা এবং মহাজনদের অত্যাচারের জন্যই গরীব গ্রামবাসী আরো গরীব হয়। নানাভাবে তাই শায়েস্তা করতে থাকেন তাদের। অবশেষে প্রজাদের এই দুর্দশা দূর করার পাকা ব্যবস্থা করার জন্য এবং তাদের পর্বত প্রমাণ ঋণের বোঝা লাঘব করার উপায় হিসেবে ১৯০৫ সালে তাঁর জমিদারী কালীগ্রাম পরগণার সদর পতিসরে "পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক" নামে এক ব্যাঙ্ক খুলে দিলেন। এতে বহু প্রজা ঋণমুক্ত হয় এবং অনেক মহাজন ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই সমবায়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, গ্রামকে বাঁচাতে হলে সমবায়নীতি ছাড়া গতি নেই। সেইজন্য তিনি জমিদারিতে ঐকত্রিক চাষ, অর্থাৎ সমবায়ের মাধ্যমে ফসল ফলাবার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন এবং সমবায় প্রথায় পতিসরে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন। এই সব ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত তেমন সাফল্য অর্জন না করতে পারলেও তাঁর উদ্যোগের তারিফ না করে উপায় নেই। সমবায় সম্বন্ধে "কালান্তর" গ্রন্থের "স্বরাজসাধন" প্রবন্ধে তিনি নিজের অভিমত অভিব্যক্ত করেছেন অতি সুন্দর করে: "যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা—স্বাস্থ্য—অন্ন উপার্জনে আনন্দবিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামেই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। একটা থেকে আর একটা দীপের শিখা জ্বালোনো কঠিন হবে না।" তিনি যথার্থ অনুভব করেছিলেন যে, মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যের মূলই হচ্ছে ধর্মবুদ্ধি। তারই বলে বলীয়ান হয়ে মানুষে মানুষে মিলন হয় গভীর ও সার্থক। আর এই সত্য বিকৃত হলেই সে হয়ে যায় দুর্বল। তখন তার জলাশয় হয় জলশূন্য, সে রোগাক্রান্ত হয়, তার শস্যক্ষেত্রে শস্য ঠিকমতো ফলে না, অজ্ঞানতার অন্ধকারে সে ডুবে মরে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, সমবায় তত্ত্ব থেকে বহু কর্মধারা সৃষ্ট হতে পারে। কারণ প্রতি পদে পদেই মনের সঙ্গে এর মোকাবিলা করতে হয়। মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে মেলাতে না পারলে কোন সামাজিক সমস্যার

সুরাহা হতে পারে না, এটা তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তিনি এও বুঝেছেন যে, শুধু মাত্র কথার দ্বারা ফল অল্পই পাওয়া যায়, তাই কাজে লেগে যেতে হবে এবং তিনি এ ব্যাপারে নিজেও যে সত্যি সত্যি কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন সে কথা তাঁরই ভাষায় আমরা পাই তাঁর "সমবায়নীতি" গ্রন্থে: "কোন কোন গ্রাম নিয়ে সেগুলিকে ভিতরের দিক থেকে সচেতন করার কাজে আমি নিজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তখন আমার সঙ্গে কয়েকজন তরুণ যুবক সহযোগী রূপে ছিলেন। এই চেষ্টার ফলে একটি জিনিস আমার শিক্ষা হয়েছে সেটি এই—দরিদ্র হোক, অজ্ঞান হোক মানুষ যে গভীর দুঃখ বোধ করে তার মূলে সত্যের ত্রুটি। মনের যে দৈন্যে মানুষ আপনকে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে সেই দৈন্যেই সে সকল দিকেই মরতে বসে তখন বাইরের দিক থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না।"

অতএব আমরা দেখি যে, রবীন্দ্রনাথ আদর্শের সঙ্কীর্ণতাকে কোনদিন মেনে নিতে পারেননি। তিনি তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলির অনুধাবন করে জেনেছিলেন যে, সমাজের গভীরতম স্তরে সাড়া জাগাতে না পারলে যা কিছু তথাকথিত সংস্কার সবই হয়ে থাকে এ অর্থনীতির বহিরঙ্গ, তার মর্মমূলে গিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই "রায়তের কথা"য় তিনি লেখেন: "পল্লীর মধ্যে সমগ্র ভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে। কেমন করে সেটা হবে? সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কিনা জানিনে, জবাব তৈরী হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে।" সুখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তির অভিজ্ঞতা-প্রসূত উপদেশ ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা আজকাল ঐ "মোটা জবাবটাই" খুঁজে বার করার জন্য গ্রাম নিয়ে নতুন করে গবেষণা করে চলেছি এবং নানাপ্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করে কিছু কিছু সুফলও পাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে আরো পাবো বলে আশা রাখি।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক কৃষি ও রবীন্দ্রনাথ

"বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্য যুগ আসবে।"

—**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

রবীন্দ্রনাথের দেশসেবার পরিকল্পনার পুরোভাগে ছিল গ্রামোন্নয়ন। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশের গ্রামের ভেতর বাস করে অনুভব করেছিলেন যে, যে দেশের বেশীরভাগ মানুষই কৃষি গোপালনাদি কাজে নিযুক্ত সে দেশের প্রধান সমস্যাই হচ্ছে খাদ্য সমস্যা। অতএব বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি ও গোপালন চর্চা ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। তাঁর বক্তব্য: "কৃষিকার্যে নূতন জ্ঞান নূতন চিন্তা প্রয়োগ করিবার দিন আসিয়াছে। আজ পৃথিবীতে সর্বত্রই ফসল ফলানোর ব্যাপার কেবলমাত্র চাষীর হাতে নাই। জ্ঞানী বুদ্ধিমান ও উদ্ভাবন পটু যান্ত্রিকদল ইহাতে মন দিয়াছেন। ...অতএব "কালের সঙ্গে যারা সামঞ্জস্য না করে উজান ঠেলে সাবেক যুগে ফিরে যেতে চায় তারা কালের দ্বারা নিহত হয়।...কল যেখানে দৌরাত্ম্য করে বৈজ্ঞানিক কলের সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক কর্মপ্রণালী লড়তে পারবে না।" তাইতো তাঁকে আরো লিখতে দেখি: "আমাদের দেশের চাষের ক্ষেত্রের উপরে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে।"

আমরা জানি এইসব বিবেচনা করেই বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ও গোপালন চর্চার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ নিজপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদারকে ১৯০৬ সালে এবং জামাই নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে ১৯০৭ সালে আমেরিকায় পাঠান। তাঁর নিজের ভাষায়: "আমি আমার ছেলেকে আর সন্তোষকে পাঠালুম কৃষিবিদ্যা আর গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসতে। এই রকম নানাভাবে চেষ্টা ও চিন্তা করতে লাগলুম।" এ ব্যাপারে তাঁর মনের জাগ্রত অভি-

প্রায়ের ইঙ্গিত পাই নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে লেখা একটা চিঠি থেকে : "তোমরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজার অন্নগ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ···ফিরে এসে এই হতভাগ্যের অন্নগ্রাস কিছু পরিমাণেও যদি বাড়িয়ে দিতে পার তাহলে এই ক্ষতিপূরণ হয়ে মনে সান্ত্বনা পাব।" পিতার এই অভিপ্রায় পুত্র রথীন্দ্রনাথ যথার্থ উপলব্ধি করে লিখেছেন : "কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে গেলে কৃষির উন্নতি করা বিশেষ দরকার। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষির উন্নতি হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান আমাদের দেশেও প্রবর্তন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্য পাঠালেন। তার এক বছর পরে আমার ভগিনীপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও সেখানে পাঠালেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে আমরা তিনজনে গ্রামোন্নয়নের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে পারব তাঁর আশা ছিল।"

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র ইলিনয় ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেবার বছর তিনেক আগে, অর্থাৎ ১৯০৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্রকে একটা চিঠিতে লেখেন : "জমির সন্ধান কোরো। ভবিষ্যতে বিশেষ কাজে লাগবে। সন্তোষ ও রথীকে agriculture-এর জন্যই তৈরী করা স্থির করেছি—ওরা দুইজনে মিলে চাষবাস করবে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করে জীবন কাটাবে। চাষের কাজে স্বাস্থ্যকর জায়গা থাকা দরকার —নইলে কালিগ্রামে জমি যথেষ্ট আছে।" নিজের ছেলে ও বন্ধুর ছেলে দেশে ফিরে এসে যাতে দেশের কাজে লাগতে সক্ষম হয় সেজন্য উত্তরোত্তর উপযুক্ত চাষের জমি জোগাড় করার জন্য তাঁর ব্যাগ্রতা বেড়ে চলেছে কতখানি তা বোঝা যায় ১৯০৬ সালে আবার তাঁর সেই বন্ধু শ্রীশচন্দ্রকে লেখা আর একটি চিঠি থেকে : "রথীদের গত সপ্তাহের পত্রে তাহারা এইবেলা জমি সংগ্রহের কথা বলিয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা যেখানে তাহাদিগকে চাষ করিতে হইবে সেখানকার মাটির নমুনা লইয়া তাহাদের কলেজ laboratory-তে analyse করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং সেখানকার সমস্ত প্রাকৃতিক বিবরণ জানিয়া অধ্যাপকদের

সহিত পরামর্শ করিয়া আসে।" এইরকম জীবনযাপন যে জীবন্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজের আদর্শে ও কল্পনায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যখন তিনি নিজের কথা ভেবেও "বন্ধুপল্লী" স্থাপনের জন্য জমির ব্যবস্থা করতে বন্ধু শ্রীশচন্দ্রকে ১৯০৪ সালে অনুরোধ করেন: "সকলে মিলিয়া চাষবাস করিয়া গোরু-বাছুর রাখিয়া বিশ্রব্ধ আলাপে এবং ভাবের চর্চায় সুখে থাকিব।"

পিতৃদেবের এই মনোবাসনা পূরণ করতে ব্রতী হয়েছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর সহপাঠিদের নিয়ে। ১৯০৮ সালে কালীমোহন ঘোষ গ্রামের কাজে যোগ দেন। ১৯০৯ সালে রথীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিদেশ থেকে ফিরে লেগে গেলেন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষাবাদের কাজে। ঐ সময় পিতা-পুত্রে অনবরত ঐসব ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনা চলত। কুঠিবাড়ির লাগোয়া ৮০ বিঘা খাস জমিতে গবেষণাগার শুরু হয়। ১৯১০ সালে ট্রাকটর, সার, পাম্পসেট ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ হয় অধিক ফলনশীল আমেরিকান ভুট্টা, আখ, টমেটো, আলু প্রভৃতির চাষ। এ সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে খুব সুন্দর ভাবে লেখেন: "শিলাইদহে আমার নূতন জীবন শুরু হল—আমি যেন ইংলণ্ড-আমেরিকার পল্লী অঞ্চলের একজন সম্পন্ন কৃষাণ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে খেত তৈরী হল, আমেরিকা থেকে আমদানি হয়ে এল ভুট্টার বীজ ও গৃহপালিত পশুর জাব খাবার মতো নানাবিধ ঘাসের বীজ। এদেশের উপযোগী করে নানারকম লাঙল, ফলা, ও কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরী করা হল, এমনকি মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য ছোটোখাটো একটি গবেষণাগারের পত্তন হল। তিনি আবার এজন্য মাইরন ফেল্‌পসের প্রশংসার কথা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেন: "তিনি আমাদের মস্ত সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, বলেছিলেন শিলাইদহে আমি নাকি একটি সত্যিকারের ভালো আমেরিকান ফার্ম গড়ে তুলতে পেরেছি।"

পিতার নির্দেশ যে রথীন্দ্রনাথ কিভাবে পালন করার চেষ্টা করেছিলেন তা অন্যত্র আবার বিশদভাবে লিখেছেন: "বাবার নির্দেশ অনুসারে আমি কৃষির উন্নতির নানাবিধ চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলুম। শিলাইদহ কুঠি বাড়ির সংলগ্ন কতক জমি খাস করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র

প্রতিষ্ঠা করলুম। আমেরিকা থেকে চাষ আবাদের কয়েকটি যন্ত্রপাতি আনিয়ে সেখানে তার পরীক্ষা চলতে লাগল। চাষীরা ধান ছাড়া অন্য ফসলের চাষ তেমন করে না দেখে ঐ অঞ্চলে rotation করে দু-একটা money crops করা যায় কিনা তার পরীক্ষা হতে থাকল। আমেরিকা থেকে ভাল ভুট্টার বীজ আনালুম। চাষীদের আলু ও টমেটোর চাষ শেখানো হল। শিলাইদহের দো-আঁশলা মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় কি কি খাদ্যসামগ্রীর অভাব তা জানবার জন্য ছোটোখাটো একটা রাসায়নিক ল্যাবরেটারী গড়ে তুললুম।”

আমরা জানি যে, সস্তায় নৌকা বোঝাই ইলিশমাছ কিনে চুন দিয়ে মাটিতে পুঁতে রেখে ভাল সার তৈরীর ব্যবস্থা হয় শিলাইদহে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়: “নামমাত্র মূল্যে কয়েক নৌকো বোঝাই মাছ কিনে নিয়ে এসে চুন দিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখলুম। একবছর পরে মাটি খুঁড়ে দেখি চমৎকার সার হয়েছে। তখন মাছের সার প্রচলনের চেষ্টা করলুম।” আমরা এও জানি যে, পতিসরে স্বয়ং রথীন্দ্রনাথ ট্রাকটর চালান এবং তাতে ক্রমে চাষীদের মধ্যে ট্রাকটর ব্যবহারে উৎসাহের অন্ত ছিল না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উত্তর বঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে যে টাকা তুলেছিলেন তার উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে আত্রাইতে স্থায়ীভাবে একটা খাদি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েকটা ট্রাকটর কেনেন, কেননা বন্যায় গরু মরে যাওয়ায় লাঙ্গল চালাবার অসুবিধা। রথীন্দ্রনাথ আচার্য রায়ের কাছ থেকে একটা ট্রাকটর চেয়ে নিলেন। ট্রাকটর তো পাওয়া গেল, কিন্তু চালাবে কে? এর উত্তর পাই রথীন্দ্রনাথের নিজের লেখাতেই: “নিজেই চালাতে লাগলুম। আমেরিকায় আমার অভ্যাস ছিল এ কাজের—ক্রমশ কয়েকদিনের মধ্যে গ্রামের একটি ছোকরাকে চালানো শিখিয়ে দিলুম।…ট্রাকটর দিয়ে চাষ করার পরীক্ষা যেদিন হবে সে একটা স্মরণীয় দিন কালীগ্রাম পরগণায়। সকাল থেকে হাজার হাজার লোক জমে গেল এই দানবীয় মেশিনটার কাজ দেখার জন্য। তাদের কৌতুহল মেটাবার জন্য ট্রাকটর নিয়ে আমি নেমে গেলুম ধান খেতে। কয়েকজন চাষীকে জিজ্ঞাসা করলুম,…আল

বাঁচিয়ে ছোট ছোট খেত মেশিন দিয়ে চাষ দেওয়া সম্ভব নয়। তারা আমাকে আশ্বাস দিল,…।" প্রথম দিনের পরীক্ষাতেই কৃষকরা বেশ খুশি হল। ট্রাকটর পতিসরেই থাকবে ঠিক হল। ভাড়া নির্দ্ধারিত হল বিঘা প্রতি ১ টাকা মাত্র। তারপর থেকে সর্বত্র ট্রাকটরের চাষ চলতে থাকল এবং তা ভাড়া নেবার জন্য কৃষকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে গেল। পতিসর থেকে চলে আসার আগে রথীন্দ্রঠাকুরকে কথা দিতে হয়েছিল যে, আগামী বছর আরো ট্রাকটর আনিয়ে দেবেন।

পিতৃদেবের এই আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার বাসনায়, তাঁর আরব্ধ কাজের প্রতিষ্ঠানগত রূপদানে তাঁকে সুখী করার প্রয়াসে নিজেকে একটু কাজের মানুষ গড়ে তুলতে রথীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবন থেকেই কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার আভাস পাওয়া যায় নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর এক চিঠি থেকে: "ধান ভানার জন্য threshing machine একটা কিনতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু তাহলে আবার একজন expert আনতে হয়। তোমার পক্ষে কি এটা শেখা সম্ভব হবে? সর্বদা দৃষ্টি রাখবে কোনও রকম ছোটখাট simple devices বা machine-এর খোঁজ পাও কিনা। আর একটা কথা মনে রেখো যদি ইতিমধ্যে কেউ ভারতবর্ষে ফিরে আসছেন খবর পাও তো তাঁর সঙ্গে california-র seedless orange-এর কিছু চারা পাঠাতে চেষ্টা করো। Sylhet-এ ব্রজেন্দ্রকিশোর বাবুর মস্ত লেবুর বাগান আছে—সেখানে seedless লেবুর গাছ করা যায় কিনা দেখা কর্তব্য। আর আমাকে অল্প কিছু Sun hemp, california fig, musk melon ও water-melon এর বীজ পাঠিও।"

ধানভানা মেসিন এর প্রচলনে রবীন্দ্রনাথের কি রকম উৎসাহ ছিল তা জানা যায় পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা পিতা রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠি থেকে: "বোলপুরে একটা ধান ভানা কল চলছে—সেইরকম একটা কল এখানে (পতিসরে) আনাতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এ দেশ ধানেরই দেশ—বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়। আমার

ইচ্ছা ৫/১০ টাকা শেয়ার করে এখানকার অনেক চাষায় মিলে এই কলটা যদি চালায় তাহলেই ওদের মধ্যে মিলে কাজ করবার যথার্থ সূত্রপাত হতে পারে। আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে ধার দিয়ে ··· চালানো যেতে পারে ··· এতে প্রজাদের উপকার হবে। এই কলের সন্ধান দেখিস।"

রবীন্দ্রনাথ জমিকে দুতিন ফসলা করার জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি লিখেছেন: "শিলাইদহে কুঠিরবাড়ির চারদিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নূতন ফসলের প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলাম। ···আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারী কৃষিতত্ত্ব প্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি।" প্রথমে কবি নাট্যকার ও কৃষিবিশারদ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে আলু চাষ আরম্ভ করেন। তাতে লোকসান খেতে হয়েছিল বটে, তবু তিনি আশা করেছিলেন যে, এর প্রচলন লাভজনক হতে পারে। এছাড়া প্রজাদের বাস্তুবাড়ি, ক্ষেতের আইল, বেড়া প্রভৃতি স্থানে কলা, ভুট্টা, কপি, আনারস, পাটনাই মটর, খেঁজুর, শিমুল, আঙ্গুর ইত্যাদি গাছ লাগাতে উৎসাহিত করতেন। ভূপেশচন্দ্র রায় নামে এক কর্মীকে লেখা তাঁর এক চিঠি থেকে এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা হতে পারে: "প্রজাদের বাস্তুবাড়ি, ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেঁজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সূতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল আঙ্গুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে। অবশ্য তাহাতে জলসেচন আবশ্যক করে। এই জন্য প্রত্যেকে যদি নিজের ভিটায় দুই এক কাঠাও বপন করে তবে তাহার জলসেচন নিতান্ত অসাধ্য হয় না। কাছারিতে যে আমেরিকান ভুট্টার বীজ আছে তাহা পুনর্বার লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

আবার কখন কোন্ ফসল চাষ করতে হবে, তার প্রকরণ ও সার কি কি এসব সম্বন্ধে সারকুলার বিলি করা হত এবং হাতে কলমে কৃষি শিক্ষা

দেবার ব্যবস্থাও রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। তিনি যে চাষাবাদের উন্নতির চেষ্টায় কিরকম উৎসুক ছিলেন সে সম্পর্কে আরো ভাল করে জানতে হলে নিজপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটা চিঠি পড়া দরকার: "গয়ায় খানিকটা জমি ফসল হত না বলে পড়ে ছিল—শিবপুরের একজন ছাত্র মাটি পরীক্ষা করে সেখানে খেঁসারির ভাল চাষ করাতে প্রচুর খেঁসারি হয়েছে—এখন তার চারি পাশের চাষারা তাদের পতিত খারাপ জমিতে খেঁসারি দিয়ে খুব লাভ করচে— তোদের ওখানে জমির জন্যে তো ভাবনা নেই—খারাপ জমি উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। যেখানে জলের অত্যন্ত অভাব সেখানকার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার কি একটা গাছ লাগিয়ে ভারতবর্ষের কোথাও বিশেষ ফল পাওয়া গেছে—সেই গাছ গরুর খাদ্য। গাছটা কি জানলে বোলপুরের জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে।"

যখন ১৯২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী এলম্‌হার্ষ্ট সাহেবের সহায়তায় সুরুলের শ্রীনিকেতন কুঠিবাড়িতে গ্রাম পুনর্গঠন কেন্দ্র স্থাপিত হল তখন শিলাইদহের সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা সম্বল করে নূতন কর্মযজ্ঞ শুরু হল নতুন উদ্দীপনায়। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়: "শিলাইদহে যা কাজ আরম্ভ করেছি, এখানেও তাই করব। ...এই কাজে আমার বন্ধু এলম্‌হার্ষ্ট আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। তিনিই এই জায়গাকে একটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র করে তুললেন। এলম্‌হার্ষ্টের হাতে এর কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল।"

এলম্‌হার্ষ্ট কিভাবে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এই পবিত্রকর্মে আমন্ত্রিত হলেন তা বেশ গর্বের সঙ্গেই সাহেব নিজে বিবৃত করেছেন: "...while studying in America, I received a wire from Dr. Tagore asking me to come out to India and to initiate at the new University some kind of Agricultural work." তিনি রবীন্দ্রনাথের এই অনুরোধ রক্ষা করাতে রবীন্দ্রনাথ কতখানি খুশি হয়েছিলেন সেটা তাঁর বক্তব্যতেই সুস্পষ্ট: "আর একজন সহৃদয় ইংরেজ এলম্‌হার্ষ্ট, তিনি এক পয়সা না নিয়ে নিজের খরচে বিদেশ থেকে নিজে

টাকা সংগ্রহ করে সে টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তিনি দিনরাত চতুর্দিকের গ্রামগুলির দুরবস্থা কি করে মোচন হতে পারে, এর জন্য কি না করেছেন বলে শেষ করা যায় না।” এলমহার্স্ট তাঁর নিজের কাজের প্রকৃতিও অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন: “When Dr. Tagore handed over to us his farm at the village of Surul in the Birbhum district, as the basis of our operations for the founding of a school of Agriculture and the study of village economics, we were compelled to examine not merely the condition of the soil around us, but the history, social, economic and political, which lies behind that condition.”

এইভাবে আমরা দেখি যে, এলমহার্স্ট শ্রীনিকেতনে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও কাজকর্ম শুরু করে দেন এবং সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐসব বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। এলমহার্স্টের বক্তব্য যে, মানুষ মাটির ধন অপহরণ করে। মাটি থেকে সে তার সব খাদ্য সংগ্রহ করে। অথচ মাটিকে সে যথেষ্ট পরিমাণে তার খাদ্য ফিরিয়ে দেয় না। তাই মাটি রিক্ত হয়ে পড়ে এবং চতুর্দিকের খাদ্যাভাব ও তজ্জনিত ব্যাধি পৃথিবীর মানুষকে দুর্বল করে ফেলে। অতএব চাষযোগ্য জমি সীমিত থাকায় ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করতে না পারলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য যোগান দিয়ে মানুষকে শক্তিশালী করে তুলতে না পারলে দেশের মূল সমস্যার সমাধান অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এইসব ব্যাপারে সরকারী মহল থেকে ভাল বীজ, যন্ত্রপাতি, জলসেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য আদায়ে এলমহার্স্ট কিরকম তৎপর হয়েছিলেন তার বিবরণ জানা যায় তাঁর ডাইরি পড়ে: “On return to Santiniketan I found that Dasgupta of the Bengal Agricultural Ministry and Chakravarty, the water engineer, had arrived—I sat down with Dasgupta to try

and find out what help, if any, we were likely to get from Government agricultural people—'The goverment of Bengal should,' said Dasgupta, 'establish a farm here and hand it over to you, but anyhow we should be able to send you seed and implements, and I would like to come up here, regularly, once a week, if you want me.' He seemed delighted with our plans. Chakravarty had postponed his departure and took me out for a walk. He promised, however, that he would bore for us at Surul the finest well."

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে, এলম্‌হার্স্টের হাতে শ্রীনিকেতনের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। এলাম্‌হার্স্টও অনুভব করেছিলেন যে, কবি তাঁর বিদ্যালয়ে একটি ভাল কলা বিভাগ এবং একটি ভাল কৃষি বিদ্যালয়—এই দুটো জিনিস আশা করেছিলেন এবং পেয়েও ছিলেন তিনি। তাইতো তিনি মহাখুশি। সাক্ষী রইল এলম্‌হার্স্টের ডাইরির পাতা: "Gurudev was delighted. On the way home he overdid himself by saying hat he'd always hoped for two things at his school, a good Art Department and a good Agricultural school and now he'd got them both and something of a genius at the head of each." সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর যতীন বাবু নামে এক ভদ্রলোককে শ্রীনিকেতনের জন্য দিয়েছিলেন। তিনি এলম্‌হার্স্টের সহায়তায় বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি হিসাব নিকাশের দিকে নিজেকে মগ্ন করেছিলেন। সেইজন্যইতো আনন্দের সঙ্গে এলম্‌হার্স্ট লিখেছেন: "Jatin Babu has been lent to us by Suren. He now wants to make his home here. He's got the reputation of being a first-rate accountant and has already absorbed

the standard works I brought out with me on Farm Accounting from America and England."

বিজ্ঞানসম্মত পশুপালনের ব্যাপারেও এলমহার্স্ট সর্বদা চিন্তা ভাবনা করতেন। তাই সুযোগমত এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ সন্তোষ মজুমদারের সঙ্গে পরামর্শাদি করতেও তিনি ভুলতেন না। তাঁর ডাইরির পাতা থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে: "We began immediately to discuss some of the main problems that would face us; the lack of fodder for livestock; the prospects for keeping goats for milk as they do in the U. P., or for turkeys, for runner ducks or geese; the difficulty of finding a cheap mode of fencing, prickly pear perhaps; or of starting a dairy co-operative" এই ভাবে ক্রমশঃ তিনি সন্তোষ মজুমদারকে দলে টানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন: "I hope Santosh majumder can be persuaded to join us at surul for he has been working on so many of these problems for years."

এইরকম সমবায় ডেয়ারী খোলার ব্যাপারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও উৎসাহের পরিচয় আমরা পাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর একটা চিঠি থেকে: "...সন্তোষ পাঁচটি গোরু নিয়ে বোলপুর বিদ্যালয়েই একটি ছোট-খাটো ডেয়ারী খুলেছে। ...দেশে গোরুর উন্নতি করার বিশেষ প্রয়োজন। নইলে আর কিছুদিন পরে চাষের ভয়ানক দুর্গতি হবার আশঙ্কা আছে। ...শুনতে পাই আয়র্লাণ্ডে এই সমবায় মণ্ডলীর খুব প্রচলন ও উন্নতি হয়েছে। সেখান থেকে co-operative Dairy প্রভৃতি কাজের প্রণালী যদি তুমি কিছুদিন দেখে শুনে আসতে পার তা হলে এ দেশে সেটা কাজে খাটাতে পার।"

আমরাতো জানি যে, গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল নীতিই হল সমবায়। এমনি ধরণের সমবায় যা মানুষকে সমস্ত ক্ষেত্রে মহৎ কাজে

প্রেরণা দেবে। তিনি বুঝেছিলেন গ্রামকে বাঁচাতে হলে সমবায়-নীতি ছাড়া গতি নাই। সেইজন্য তিনি তাঁর নিজের জমিদারিতে ঐকত্রিক চাষ, অর্থাৎ সমবায়ের মাধ্যমে ফসল ফলাবার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন: "সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙ্গল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।" সেই কারণেই তিনি আবার লিখেছেন: "চাষীদের মধ্যে ফসল উৎপাদনের সমবায় প্রণালী প্রবর্তন করতে হবে, প্রদেশে প্রদেশে উৎকৃষ্ট বীজের ভাণ্ডার স্থাপন করতে হবে, জমির প্রকৃতি পরীক্ষার ও উপযুক্ত সার জোগাবার প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে।" চাষীদের তিনি তাই বলেছেন: "তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ কর, সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র কর, তা হলে অনায়াসে ট্রাকটর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে।"

এইরূপে যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষাবাদ করলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে মেহনত বেঁচে যায়। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ—আমেরিকার উদাহরণ দিয়েছেন যে, সেখানে সমস্ত চাষীই এ পথে হু হু করে চলেছে: তাঁর ভাষায়: "তাহারা কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে আঁটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে।" তিনি মনে করেন যে, এতে সুযোগ মাত্রকে অবিলম্বে এবং পুরোপুরি আদায় করে নেওয়া যায়, সময় কত বেঁচে যায়। সময়ই মূলধন। সময়কে অধিকার করাই সভ্য মানুষের কাজ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন: "যত অল্প সময়ে যে যত বেশি কাজ করিতে পারে তারই জিত। এই জন্যই মানুষ হাতিয়ার দিয়া কাজ করে।" কল চালাতে গেলে জমি ও অর্থ উভয়ই বেশি দরকার ঠিকই। সেজন্য তিনিতো বলছেন যে, সমবায় প্রথা অবলম্বন করলে এসবের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলছেন: "তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরীব হইয়াও বড় মূলধনের সুযোগ আপনিই

পাইবে। তখন কল আনাইয়া লওয়া, কলে কাজ করা, কিছুই কঠিন হইবে না।”

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে, আমাদের কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির জন্য একটা দারুণ কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। তাই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন রাশিয়ার ঐকত্রিক কৃষিব্যবস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক যান্ত্রিক কৃষির প্রসারের প্রতি। আজ যখন আমরা কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রীকরণ করে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষা-বাদের দিকে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃষি উন্নয়নের নূতন কার্যপ্রণালী গ্রহণ করে “সবুজ বিপ্লব”কে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রয়াসে উঠে পড়ে লেগেছি তখন রবীন্দ্রনাথ অত আগেই যে এই সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে যে সব চিন্তাভাবনা করেছেন এবং নিজ জমিদারীতে ও শ্রীনিকেতনে তার বাস্তব রূপদানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে কথা স্মরণ করে আজ আমরা তাঁর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী সূত্রে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং তাঁর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি যাতে আমাদের এই শুভকর্মপথে তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে চলতে পারি।

॥ পাঁচ ॥

সমবায় ও রবীন্দ্রনাথ

"সমবায়তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয় ;
এইজন্য বহু কর্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হতে পারে।"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"সমবায়" কথাটির মধ্যে সকলের সম্মিলিত ক্রিয়া ও উদ্দেশ্য সিদ্ধি—এই দুটোকেই একসঙ্গে মেলাবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই কিছু একই মানসিকতার মানুষের স্বেচ্ছায় সংঘবদ্ধভাবে সাম্য বজায় রেখে গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণ কামনায় কর্মে লিপ্ত হওয়াকেই সমবায় বলা যায়। এর অন্তর্নিহিত আদর্শ হচ্ছে যে, সকলেই সকলের জন্য এবং প্রত্যেকে পরের জন্য কাজ করবে।

আমরা জানি যে, ভারতবর্ষ একটা গ্রাম-নির্ভর দেশ। ভারতীয় অর্থনীতি মূলতঃ একটি গ্রামীণ অর্থনীতি। এখানকার অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। তাদের বেশির ভাগই আবার কৃষিজীবি এবং অশিক্ষিত। তারা এখনও দারুণ দারিদ্র্যের অভিশাপে জর্জরিত। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, আজও বহু ভারতীয় গ্রামবাসী দারিদ্র্য-সীমার নীচে থেকে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে। অতএব আমাদের এইসব অজ্ঞ, দলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, পীড়িত, দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবনে জ্বেলে দিতে হবে আশার আলো।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের জমিদারীতে গিয়ে গ্রামবাসীদের গভীর সংস্পর্শে এসে ঐ কথাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। নিমগ্ন থাকতে পারেননি নিছক কাব্যবিলাসে। তাইতো তিনি লিখলেন "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় :

"..... এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে

ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"

আর এইসব দীন দরিদ্র মানুষদের জীবনে এইরকম আশা, সাহস, বল-ভরসা, উদ্দীপনা ও মুক্তির বাণীকে কার্যকর রূপ দিতে পারে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চায়েতী রাজ এবং ঐ সমবায় ব্যবস্থা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "ভারতবর্ষে আজ দারিদ্র্যই বহুবিস্তৃত, —এইজন্যই সমবায়নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই।" তিনি যথার্থই বুঝেছিলেন যে, ইউরোপে আজকাল কো-অপারেটিভ প্রণালী বা সমবায় বলতে বোঝায় এমন একটা উপায় যেখানে অনেক মানুষ অনেক গৃহস্থ একজোট হয়ে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করে। তিনি আরো স্পষ্ট করে বললেন: "আমার কাছে মনে হয়, এই কোঅপারেটিভ—প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।" শুধু আমাদের দেশে নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই তিনি এই সমবায় নীতির জয়গান গেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেশের উন্নতির পথ হিসাবে সমবায়ের মূলতত্ত্বস্বরূপ "অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করবার যে উপায়," "শুধু টাকায় নয়, মনে ও শিক্ষায় বড় হইবে" "মিলিয়া বড় হইবে." "জনসাধারণের নিজের অর্জনশক্তিকে মেলাবার উদ্যোগ" প্রভৃতি বহু কথা অনেক রচনায় আলোচনা করেছেন। তিনি সমবায়ের মধ্যে পরস্পর মিলিত মানুষের শক্তিকেই অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, এই শক্তি গড়ে ওঠে ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সেবার দ্বারা, পরস্পর মৈত্রী বন্ধন দ্বারা। এগুলির সাহায্যে বিক্ষিপ্ত শক্তি একত্রিত হয়। এই একত্রিত শক্তির নামই সমবায়। আর এই সমবায় গড়ে উঠলে মানুষের সঞ্চিত মূঢ়তা, ঔদাসীন্য অপরাধ, যুগযুগ সঞ্চিত অভিশাপ, দারিদ্র্য প্রভৃতি দূর হয়ে যায়। এই আদর্শকেই রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা করেছেন নিজের দেশের এবং বাইরের ইউরোপের বিভিন্ন দেশে।

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন আমাদের দেশ যে গরীব তার প্রধান কারণ দেশের শ্রীহীনতা নয়, ঐশ্বর্যশূন্যতা নয়, আমাদের দেশের মানুষ ছাড়া ছাড়া হয়ে বাস করে, নিজের দায় একলা বহন করে। তাই তিনি বলেছেন: "এইজন্য ইউরোপে যারা কেবল গরিবদের জন্য ভাবিতে লাগিলেন তারা এই বুঝিলেন যে, যারা একলার দায় একলাই বহিয়া বেড়ায় তাদের লক্ষ্মীশ্রী কোন উপায়েই হইতে পারে না, অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন।" মূলধনের এই সংজ্ঞার্থ পৃথিবীতে এমন সুন্দরভাবে বোধ হয় আর কেউ দেয়নি। তিনি মনে করতেন: "আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত হয়ে আছে, এই সহজ কথাটা বুঝলে ও কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচবো।"

রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের সম্পদ ও স্বাধীনতা দেশের গ্রামের মধ্যেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন। "স্বদেশী সমাজ"-এ গ্রামের সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে যে সব কথা তিনি বলেছেন তার কিছু কিছু কাজ নিজেই আরম্ভ করেছেন। আমরা জানি ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের সময় Co-operative Cedit Societies Act পাশ হয়। কিন্তু তা মূলত: গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ঋণ দেওয়া ও সেজন্য সেখান থেকে পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের পর রবীন্দ্রনাথই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম শিলাইদহে ও উত্তরবঙ্গে এই সমিতি গঠনে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পতিসরে সমবায় প্রথায় কৃষিব্যাঙ্কতো তিনি স্থাপন করেছেনই। এছাড়া বিশেষতঃ তাঁরই প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় "বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি", যেখান থেকে প্রথম শোনা যায় সমবায় প্রথায় কৃষিকাজ করা ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ার কথা। "ভাণ্ডার" নামে নূতন প্রকাশিত এই সমিতিরই মুখপত্রে তিনি "সমবায়" শীর্ষক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখে সমবায় ব্যবস্থাকে করলেন জোরদার ও জনপ্রিয়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি উল্লেখযোগ্য: "রবীন্দ্রনাথ যখন প্রজাদের মধ্যে ....সমবায় শক্তি জাগরুক করিবার কথা ভাবিতেছিলেন তখন বাংলাদেশে সরকারী কো-অপারেটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই।"

এই সম্পর্কে সুধীররঞ্জন দাশ মহাশয়ের উক্তিটিও উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা মুস্কিল: "Over half a century ago when nobody bothered about the principles of co-operation or of their application to the rural problems Gurudeva Rabindranath Tagore thought about them and devotedly worked in this field of study as a pioneer for the uplift of the countless men and women residing in remote villages scattered all over Bengal and wallowing in the mire of poverty, ignorance and superstition."

প্রজাদের আর্থিক দুরবস্থা এবং তাদের মাথায় মহাজনকৃত ঋণের পাহাড় দেখে বিচলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তা দূর করার উপায় হিসেবে ১৯০৫ সালে তাঁর জমিদারী কালীগ্রাম পরগণার সদর পতিসরে "পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক" নামে এক সমবায় ব্যাঙ্ক খুলে বসেন। তিনি তাঁর নোবেল পুরস্কারের অর্থও এই ব্যাঙ্কের কাজে খাটাতে আরম্ভ করায় বহু প্রজা ঋণমুক্ত হবার সুযোগ পায়, অনেক মহাজন বাধ্য হয়েই ব্যবসা বন্ধ করে দেয় এবং কিছু মহাজন ঐ ব্যাঙ্কেই আবার টাকা জমা রাখতে আরম্ভ করে। এই ব্যাঙ্ক প্রজাদের বছরে শতকরা ১২ টাকা সুদে ধার দিত এবং যারা টাকা জমা দিত তাদের বছরে শতকরা ৭ টাকা হারে সুদ দিত। প্রায় ৩০ বছর ধরে এই ব্যাঙ্ক কাজ করেছিল।

১৯০৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী যে জাতীয় (পরে হিন্দুস্থান) সমবায় বীমা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে বাংলার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক আপনাপন সামর্থ্য অনুযায়ী অংশীদারত্ব গ্রহণের সম্মতি জানিয়ে এবং সমিতির এই পরিকল্পনায় অন্যান্য সকলের অনুরূপ সাহায্য ও উৎসাহ প্রার্থনা করে যে আবেদনপত্র প্রচার করেছিলেন তাতে তিনি ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরকারী। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি তাঁর জোড়াসাঁকোর

বাড়ীর একতলার একটি ঘরও ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই এর কাজকর্ম শুরু হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তৃতা থেকেও জানা যায়: "...Hindusthan Co-operative Insurance Society had its birth in one of the rooms of my house in Jorasanko." তাছাড়া এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁর কাকার অবদানের কথা অতি চমৎকারভাবে বলেছেন: "...that my uncle, Rabindranath, who was then urging on our countrymen the principles of self-determination and co-operative effort, gave us his practical encouragement and support by lending the ground floor of his house in Jorasanko, known later as Vichitra, for use as our office during the promotion stage, and it was here that the actual beginning was made. Later he also wrote out for us our first Bengali Prospectus, and joined as a signatory to the Memorandum of Association."

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের কর্তাব্যক্তিরা বেশীরভাগই ছিলেন সরকারী কর্মচারী। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এইসব ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী কতখানি গ্রহণ করেছিলেন বা একেবারেই করেছিলেন কি না সে সম্বন্ধে বেশ সন্দেহ আছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তখনও বাংলাদেশে সমবায় মূলক চাষবাস বা সমবায়শিল্প সেরকমভাবে গড়ে ওঠেনি। তখনও সমবায় সমিতিগুলি সীমিত ছিল ঋণদান সমিতির মধ্যেই। অথচ আমরা জানি যে, তিনি তাঁর নিজের জমিদারীতে ঐকত্রিক চাষ, অর্থাৎ সমবায়ের মাধ্যমে ফসল ফলাবার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন: "সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না।"

তাইতো রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়ীতে বসে যখন দেখতেন চাষীরা হাল বলদ সহকারে তাদের ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড জমিগুলি চাষাবাদ করার জন্য আসত তখন তাদের ডেকে বললেন : "তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করো, সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র কর, তাহলে অনায়াসে ট্রাকটর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্রে কাজ করলে জমির সামান্য তারতম্যে কিছু যায় আসে না, যা লাভ হবে তা তোমরা ভাগ করে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে এক জায়গায় রাখবে। সেখান থেকে মহাজনরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে।" তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে, এতে বেশী জমি এবং 'গরিব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই' পাওয়া যাওয়াতে যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে সুযোগ মাত্রকে অবিলম্বে এবং পুরোপুরি আদায় করে নিয়ে অনেক বাজে খরচ, বাজে মেহনত ও বাজে সময় বাঁচানো যায়।

রবীন্দ্রনাথ এইসব বিবেচনা করেই বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষাবাদ ও গোপালন চর্চার তাগিদে নিজপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদারকে ১৯০৬ সালে এবং জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে ১৯০৭ সালে বিদেশে পাঠান। পুত্র রথীন্দ্রনাথ পিতার এই অভিপ্রায় অন্তর দিয়ে অনুভব করে লিখেছেন : "তাঁর ধারণা হয়েছিল গ্রামের আর্থিক জীবনের মেরুদণ্ড কৃষির উন্নতি না করতে পারলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। এইজন্য তিনি স্থির করলেন বিদেশে গিয়ে সন্তোষ ও আমি যদি ভাল করে কৃষি ও পশুপালনবিদ্যা আয়ত্ত করে আসি তাহলে ফিরে এসে আমরা তাঁর দেশের কাজে সহায় হতে পারব।"

পিতৃদেবের বাসনাকে কাজে পরিণত করার প্রয়াসে প্রথম যৌবনেই যে রথীন্দ্রনাথ কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেই পরিচয় আমরা পাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর একটা চিঠি পড়ে : "মুরগী ও হাঁসের ব্যবসাটা খুব সহজ হবে—সকলেই যদি দশটা বিশটা করে পাখি পোষে তাহলে ডিম ও পাখি সংগ্রহ করে আমি কলকাতায় পাঠাতে পারব ; বেশ যখন চলতে থাকবে তখন নিজে ছেড়ে দিয়ে চাষারাই যাতে co-operative করে সেটা চালায় তার চেষ্টা করব। প্রথমে তারা co-operation বুঝবে না,

ক্রমশ একদিকে co-operative dairying, bee-keeping—প্রভৃতি ও অন্যদিকে ডালা ঝুড়ি ছাতা প্রভৃতি তৈরী করার ব্যবসা introduce করতে হবে।” রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাতে নগেন্দ্রনাথও এইরকম কাজে যোগ দেয় সেজন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন: “রথীর কাজে তুমি যদি সহযোগী হতে চাও তা হলে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। চাষাদের সঙ্গে co-operation এ চাষ করা, ব্যাঙ্ক করা…ঋণমোচন করা,…বাঁধ বেঁধে দেওয়া,…পরস্পরকে পরস্পরের সহায়তাসূত্রে আবদ্ধ করা, এমন কত কাজ আছে তার সীমা নেই।

স্যার হোরেস প্লাঙ্কেটের আয়ার্ল্যাণ্ডের সমবায় আন্দোলনে সিদ্ধি-লাভের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন। তাঁর মতে পশ্চিম আয়ার্ল্যাণ্ড অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের অবস্থার অনেক মিল আছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত থেকে ভারত যতটা শিখতে পারবে ডেনমার্ক থেকে ততটা সম্ভব হবে না। সেই কারণেই বোধ হয় যদিও রবীন্দ্রনাথ ডেনমার্কের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন যে, ওখানকার সধারণ মানুষ আপন বাড়তি দুধ একত্র করে মাখন তোলা কল এনে জোট বেঁধে মাখন, পনির, ক্ষীর, ঘি প্রভৃতির ব্যবসা খুলে দেশ থেকে দারিদ্র্য একদম দূর করে দিয়েছে তবুও তিনি জামাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়কে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকেই Co-operative Dairy-র কাজ শিখে আসতে উপদেশ দিয়ে লিখেছেন এক চিঠিতে: “দেশের অবস্থা যতই দেখতে পাচ্ছি ততই বুঝতে পারছি সর্বসাধারণকে নিয়ে co-operative প্রণালী অবলম্বন না করলে আমরা কোনমতেই দাঁড়াতে পারব না।…শুনতে পাই আয়ার্ল্যাণ্ডে এই সমবায় মণ্ডলীর খুব প্রচলন এবং উন্নতি হয়েছে। সেখান থেকে Co-operative Dairy প্রভৃতি কাজের প্রণালী যদি তুমি কিছুদিন দেখেশুনে আসতে পার তাহলে এ দেশে সেটা কাজে খাটাতে পার। আয়ার্ল্যাণ্ডের অবস্থা নানা কারণে অনেকটা আমাদের দেশের মতো,…আমার বিশ্বাস কুষ্টিয়ায় আমাদের প্রজাদের নিয়ে Co-operative Dairy খোলার ভাল ক্ষেত্র আছে।”

এ প্রসঙ্গে আবার রবীন্দ্রনাথ আয়ার্ল্যাণ্ডের কবি ও কর্মবীর A. E.

(George Russell) রচিত "National Being" বইটির উল্লেখ করে বলেন যে, স্যার হোরেস প্লাঙ্কেট যখন আয়ার্ল্যাণ্ডে সিদ্ধিলাভ করেছেন তখন তিনি একই সঙ্গে ভারতের জন্যও সিদ্ধিকে আহ্বান করে এনেছেন। এমনিভাবেই কোন সাধক ভারতের একটা মাত্র পল্লীতেও দৈন্য ঘোচাবার মূলগত উপায় যদি প্রবর্তন করতে পারেন তবে তিনি সমস্ত ভারতবাসীকেই চিরদিনের সম্পদ দান করে যাবেন। এ ব্যাপারে যে রবীন্দ্রনাথ হোরেস প্লাঙ্কেটের সঙ্গে ১৯২০ সালের ২২শে জুলাই স্বয়ং সাক্ষাৎ করেন তা জানা যায় ছেলে রথীন্দ্রনাথের ডাইরি থেকে: "আজ স্যার হরেস প্লাংকেটের সঙ্গে বাবার অনেক কথাবার্তা হল। আলোচনার মূল বিষয় হল আয়ার্ল্যাণ্ডের সমবায় আন্দোলন।"

১৯২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী এলম্‌হার্স্ট সাহেব সুরুলের শ্রীনিকেতন-কুঠিবাড়ীতে গ্রাম পুনর্গঠন কেন্দ্র স্থাপন করায় রবীন্দ্রনাথের বহু ইপ্সিত গ্রামোদ্যোগের ব্যবস্থা হল। রবীন্দ্রনাথ দেশের কাজ বলতে যা বুঝতেন তারই মূর্তিদানের উদ্দেশ্যে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা। তাই নব উদ্যমে শুরু হল শিলাইদহের সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা দিয়ে নূতন কর্মযজ্ঞ।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংস্কারের আদর্শই ছিল সমবায়ের নীতিতে পল্লীবাসী-দের সুসংবদ্ধ করে তাঁদের সমবেত উদ্যমে পল্লীর কৃষি উন্নয়ন, পশুপালন, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করে তাঁদের সুস্থ, সবল, সমৃদ্ধ ও শোষণমুক্ত করে পল্লীসমাজকে দেশমাতার সক্রিয় ও সচেতন অঙ্গ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আর এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করার প্রয়াসে যেখানে গ্রামোন্নয়নের কোন কাজের কথা শুনেছেন ছুটে গিয়ে সেখান থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এনেছেন তিনি।

বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে (৯ ও ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯) সভাপতিত্ব করতে যখন ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সাহেব শ্রীনিকেতনে আসেন এবং বলেন: "If co-operation fails the hope of all India will fail." তখন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সুন্দরবন অঞ্চলের গোসাবা পল্লীকেন্দ্র দেখে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে যান।

তিনি ঠিক সুযোগ করে ১৯৩২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর সেখানে গিয়ে হাজির হন এবং পুরো দুটো দিন সেখানে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাহেবের কৃষিক্ষেত্রে সমবায়ের বাস্তবায়িত রূপ দেখে মুগ্ধ হন।

আবার গোপাল চন্দ্র চ্যাটার্জী নামে এক ডাক্তার গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ম্যালেরিয়া নিবারণে ব্রতী হওয়ায় তাঁকে রবীন্দ্রনাথ দিলেন সাধুবাদ। আমরা আরো জানি যে, রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় সমবায় স্বাস্থ্যোন্নতি ও পল্লীসংগঠন সমিতি করে সমবায় আইন অনুসারে তা রেজিস্ট্রী করার জন্য উপবিধি রচনা করে ছাপানো হয়েছিল। এই সহজ-সরল উপবিধির দ্বারা একটা মাত্র সমিতির মাধ্যমে পল্লীর যাবতীয় সাংগঠনিক কাজ করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৯৩২ সালে গ্রাম পুনর্গঠন কেন্দ্রের অধীনে বোলপুর শহরের কাছাকাছি বাঁদগোড়া গ্রামে প্রথম সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে গ্রাচিন গ্রীণ নামে একজন আমেরিকান ভদ্রমহিলার নাম না উল্লেখ করলে খুব অন্যায় হবে, কেননা তাঁরই প্রচেষ্টায় সুরুলে একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ক্লিনিক স্থাপন করা হয় এবং সেই ক্লিনিকের ওপর ভিত্তি করেই কালীমোহন ঘোষ বোলপুরের চারদিকের অঞ্চলে সমবায় স্বাস্থ্য সমিতিগুলি গঠন করেছিলেন।

আমরা দেখেছি যে, চাষীদের পৃথক পৃথক কাজের চেয়ে একত্রিত কাজ যে অনেক বেশী ফলপ্রসূ—এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ বারবার জোর দিয়ে বলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের চিরাচরিত কৃষিপদ্ধতির বদলে পাশ্চাত্য যান্ত্রিক পদ্ধতির গুণগান গেয়েছেন। আর দেখিয়েছেন যে, আমদের মতো দেশে যেখানে প্রায় সব চাষীই গরীব সেখানে এইরকম আধুনিক যন্ত্রনির্ভর বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজ সমবায় ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে করা সম্ভব নয়। তাঁর নিজস্ব এই ধারণার সঙ্গে রাশিয়ার কালেকটিভ ফার্মের মিল রাশিয়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণের একটা মস্ত বড় কারণ।

আর আমাদের দেশে সমবায়ের অগ্রগতি যতটুকু হয়েছিল তার বেশীর ভাগটাই উৎপাদনের দিকে না গিয়ে ঋণদানের দিকে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ যে

বড় ব্যথিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর "রাশিয়ার চিঠি" পেয়ে : "তাই কো-অপারেটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না।" তিনি আবার লিখেছেন : "আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা—উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।"

এইজন্যই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তখন অনুভব করেছিলেন যে, আমাদের কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির জন্য একটা দারুণ কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন এবং সেই কারণেই রাশিয়ার ঐকত্রিক কৃষিব্যবস্থা, বিজ্ঞানভিত্তিক যান্ত্রিক প্রসার ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে এইরকম একটা বিরাট পরিবর্তন দেখে তিনি স্বাভাবিকভাবেই খুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে এই রকম কৃষি ব্যবস্থায় নিজের স্বতন্ত্র সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তিতে মিশিয়ে দিতে অনেকে রাজী নাও হতে পারে—এ কথা তাঁর মনে উঁকি দিয়েছিল। তাতেই তিনি মাঝামাঝি একটা পথের কথা ভেবেছিলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে কিন্তু তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমিত করে দিতে হবে। মোটকথা, জোর জবরদস্তি বাদ দিয়ে ঐকত্রিক চাষ যদি সর্বসাধারণগ্রাহ্য করে দেওয়া যায় তবেই সমবায় প্রথা হয়ে ওঠে সার্থক।

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

"সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার,
মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।"
—**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা জানি সাধারণত কবি হিসেবেই। কিন্তু তিনি যে একজন কর্মীও ছিলেন সেকথা ভুললে চলবে না। সজাগ বাস্তব বুদ্ধিতে তিনি বহু পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, গ্রামই ভারতের প্রাণ। তাই গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ব্যতীত ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতি সম্ভব নয়। আর সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের দেশসেবার গঠনমূলক কর্ম পরিকল্পনার পুরোভাগে ছিল গ্রামোন্নয়ন। গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই, যেমন, বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির ভাল ব্যবস্থার দিকে রবীন্দ্রনাথ মনোযোগ দিয়েছিলেন।

আমরা জানি রবিঠাকুর যথার্থই বুঝেছিলেন যে, আমাদের প্রধান সমস্যাই হল বিশিষ্ট পল্লীসমাজ গড়ে তোলা এবং সেইজন্য এর সমাধান হিসেবে তাঁর পথ নির্দেশ : "নিজের পাঠশালা, শিল্প শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি করে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব।"

চাষীভাইদের জমিগুলি দেনার দায়ে জমিদার বা মহাজনদের হাতে চলে যাওয়া এবং তাদের শোষণ ইত্যাদি ব্যাপার রবীন্দ্রনাথকে ক্রমাগত পীড়া দিত বলেই চাষীর হাতে অবাধ মালিকানা দেবার দ্বারা ভূমি সমস্যার যে

সহজ সমাধান তাতে তিনি একমত হতে পারেননি, কেন না এতে চাষের জমি ক্রমশঃ মহাজনের হাতে গিয়ে পড়ে এবং তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর ভাষায়ঃ "জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তাহলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই। যে লোক চাষ করে না, কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই।......অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোট ছোট জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড় বড় বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে।"

গ্রামীণ অর্থনীতিতে সবল মহাজনেরা যে কিভাবে দুর্বল গ্রামবাসীদের বঞ্চনা করে আরো প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাদের শোষণের প্রবৃত্তি যে মনের কত গভীরে তা রবি ঠাকুর ভালমতো জানতেন বলেই জমিদারির কাজে এসেই চাষীদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে কড়া নজর রাখতে লাগলেন আমলা মহাজন ও জোতদারদের ওপর। গ্রামের সব ছেলেপুলে গরু—লাঙ্গল—ঘরকন্নাওয়ালা সরল নিরুপায় নিঃসহায় নিতান্ত নির্ভরপর চাষাভুষোদের তিনি একান্ত আপনার লোক বলে মনে করে তাদের দুঃখ ঘোচাতে কিছু না কিছু করতে ব্যাকুল হয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য করেই তিনি গান গেয়েছেন:

"আয় রে মোরা ফসল কাটি—
ফসল কাটি, ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা ওরে, আজ তারি সওগাতে
মোদের ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে।"

প্রজাদরদী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পরিষ্কার পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরীর "রায়তের কথা" বইতে। সেখানে আমরা সবল মহাজনদের হাত থেকে দুর্বল প্রজাদের পরিত্রাণের প্রচেষ্টার কথা পাইঃ "রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কি করে এসেছেন, তা আমি সম্পূর্ণ জানি; কেন না তাঁর জমিদারি সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্তব্য

ছিল সাহাদের (মহাজনদের) হাত থেকে শেখদের (দরিদ্র প্রজাদের) বাঁচানো।"

রবীন্দ্রনাথ বছর দুয়েক জমিদারির সব অঞ্চল ঘুরে বুঝেছিলেন যে, জমিদার, আমলা এবং মহাজন—এদের মিলিত অত্যাচারের ফলেই গরীব কৃষক আরো গরীব হয়। তাই আমলার বিরুদ্ধে প্রজারা নালিশ করলে তিনি প্রজার সমর্থন করে অনেক আমলার চাকরীও খেয়েছেন। প্রজাদের আর্থিক দুরবস্থা এবং তাদের ঘাড়ে মহাজনকৃত ঋণের বোঝা দেখে বিচলিত হয়ে তিনি তা দূর করবার উপায় হিসেবে অবশেষে ১৯০৫ সালে তাঁর জমিদারি কালিগ্রাম পরগণার সদর পতিসরে "পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক" নামে এক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক খুলে ফেললেন।

বাস্তবিকই গ্রামবাসীদের ঋণগ্রস্থতাই গ্রামীণ অর্থনীতির বড় সমস্যা। প্রজারা মহাজনদের ঋণ শোধ করার চেষ্টা যে না করে তা নয়, তবে সুদের হার এত উঁচু এবং সুদের আবার সুদ আদায় হবার জন্য আসল ঋণ কখনও শোধ হয় না। তাই ঋণের বোঝা চাষীভাইদের বংশ পরম্পরায় বইতে হয়। এই দুরবস্থার প্রতিবিধান করার একমাত্র উপায় হল যুক্তিসঙ্গত কম সুদে দরকার মতো টাকা ধার দেওয়া। এটা রবীন্দ্রনাথ জানতেন, কেন না এই ব্যাপার নিয়ে তিনি ব্যথিত চিত্তে বহু চিন্তাভাবনা করেছেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা করতে বিস্তর টাকার প্রয়োজন। অথচ তাঁর পক্ষে সেটা যোগাড় করা খুবই মুস্কিল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "পিতৃস্মৃতি"তে যথার্থই লিখেছেন: "এই সমস্যা বাবাকে সর্বদাই পীড়া দিত, তাঁকে চিন্তিত করত, এর প্রতিবিধানের কোন উপায় অনেকদিন পর্যন্ত তিনি খুঁজে পাননি।......তাদের দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায় যুক্তিসঙ্গত কম সুদে প্রয়োজনমত কর্জ দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু সে ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা লাগে, বাবার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না।"

আর সত্যি সত্যিই ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের খরচ সামলাতেই হাবুডুবু খাচ্ছেন। অনবরত বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখছেন টাকা ধার চেয়ে। যথেষ্ট দেনা করতে হয়েছে তাঁকে। স্ত্রীর গয়না, পুরীর

বাড়ী ক্রমে ক্রমে সমস্তই বিদ্যালয়ের দরুণ বিকিয়ে দিতে হয়েছে। এদিকে আবার প্রজাদের দুর্দশার কথা ভেবে তিনি স্থির থাকতে পারছেন না। সর্বদাই ছটফট করছেন তাদের দুঃখ নিবারণের জন্য কিছু একটা করতে। অবশেষে অসীম সাহসিকতার উপর ভর করে ১৯০৫ সালে স্থাপন করলেন ঐ "পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক।" ঐ ব্যাঙ্কের কাজ শুরু, তাঁর বহু বন্ধুবান্ধব ও কিছু বিত্তশালী মহাজনের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ঋণ হিসাবে নিয়ে। এইভাবেই ঋণের টাকাকে মূলধন করে কাজ আরম্ভ করল এই বেসরকারী অরেজিষ্ট্রীকৃত গ্রামীণ ব্যাঙ্কটি।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ম করলেন যারা "পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক" থেকে টাকা ধার নেবে তাদের কাছ থেকে শতকরা বার টাকা সুদ আদায় করা হবে। ব্যাঙ্ক চালাবার খরচাপত্র মিটিয়ে ও অনাদায়ী টাকার হিসাব নিয়ে দেখা যায় ব্যাঙ্কের কোন লাভই হচ্ছে না। তবু ভেঙে পড়েননি রবীন্দ্রনাথ। থেমে থাকেনি ব্যাঙ্কের কাজ। চলতে থাকে এইভাবেই। মূলধন অল্প, অথচ চাষীভাইদের প্রয়োজন প্রচুর। তাই তাদের সকলের চাহিদা মেটানো অসম্ভব। এজন্য রবীন্দ্রনাথ বেশ চিন্তায় পড়েছেন। এমনি সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ঐ ব্যাঙ্কের মূলধন বৃদ্ধির এক অপূর্ব সুযোগ এসে হাজির।

রবীন্দ্রনাথ পেলেন নোবেল পুরস্কার ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে। এই বাবদ তাঁর হাতে এসে উপস্থিত হল ১,০৮,০০০ টাকা। টাকাটা হাতে আসায় তিনি দোনামনা করতে লাগলেন। একবার ভাবছেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য টাকাটা খরচ করবেন, আবার টাকাটা প্রজাদের কল্যাণেও কাজে লাগাতে পারলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। মহা দোটানায় পড়ে তিনি কিছুতেই ঠিক করতে পারছেন না কি করবেন। শ্যাম রাখি না কুল রাখি।

এই অবস্থায় পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে প্রস্তাব দিলেন যে, টাকাটা "পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক"-এ ডিপজিট রাখা হোক। কারণ এতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। অর্থাৎ বিদ্যালয়

এবং প্রজারা উভয় পক্ষই রক্ষা পায়। প্রজারা পাবে টাকা ধার এবং বিদ্যালয় পাবে সুদের টাকা। করাও হল তাই। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পিতৃস্মৃতি"র ভাষায়: "যতদিন কৃষি ব্যাঙ্ক ছিল, বহু বছর ধরে বিদ্যালয়ের ও পরে বিশ্বভারতীর বছরে আট হাজার টাকা করে একটি স্থায়ী আয় ছিল।"

নোবেল প্রাইজের অত টাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন নামকরা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত না রেখে এই তুচ্ছ গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কেন রাখলেন সে প্রশ্নের উত্তরে তাঁর বক্তব্য ছিল যে, গ্রামের উন্নিতির জন্য চাষীভাইরা টাকা কোথায় পাবে, তাঁর ধনে তাঁর পরিবারের মানুষের যেরকম দাবী তাঁর প্রজাদের দাবী তা থেকে কোন অংশেই কম নয়। এই মনোভাবের তুলনা হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই মূলধন পেয়ে "পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক"-এর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল চাষীভাইদের বর্ধিত চাহিদা মেটানো। ফলে কালীগ্রাম পরগণার ভেতরের ও বাইরের মহাজনরা তাদের ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি অনেক মহাজন আবার এই কৃষি ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখতে আরম্ভ করে। এই ব্যাঙ্কের দৌলতে বহু দরিদ্র প্রজা প্রথম ঋণমুক্ত হবার সুযোগ পেল। L. S. S. O' Malley ১৯১৬ সালে "পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক" সম্বন্ধে লিখেছেন: "An agricultural bank advances loans to raiyats at 12 per cent per annum. The depositors are chiefly calcutta friends of the poet, who get interest at 7 per cent. The bank has about Rs. 90,000 invested in loans."

এই প্রসঙ্গে নিমাই ঠ্যাটার কথা একটু বলার লোভ সামলান যাচ্ছে না। এর আসল নাম অবশ্য নিমাই প্রামাণিক। স্বভাব দোষে গ্রামময় তার দুর্নাম রটল 'নিমাই ঠ্যাটা' বা 'ব্যাটা কালনিমে' বলে। সে কোন এক কারণে "পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক" থেকে ৩০০ টাকা ধার করেছিল পৈতৃক বাড়ীটি বাঁধা দিয়ে। এর কিছু আগেই আবার ঐ বাড়ীটি নবীন মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে ২০০ টাকা ধার নিয়েছিল। অথচ ঐ কৃষি ব্যাঙ্ক সেরেস্তায়

কায়দা করে সে ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখে বেশি টাকা ধার করল এবং সেই ৩০০ টাকাও এক ফৌজদারী মামলায় উড়িয়ে দিয়ে ফতুর' হয়ে গেল। এদিকে এই কৃষি ব্যাঙ্কের ঋণের কথা নবীন মহাজন জানতে পেরে নালিশ করে নিমাইয়ের বাড়ী ক্রোকের পরওয়ানা বার করল। আবার ওদিকে ঠাকুর জমিদার পক্ষও তার নামে চার বছরের খাজনার নালিশ এবং কৃষি ব্যাঙ্কের খতের নালিশ করে ডিক্রি করেছেন। কিন্তু নানা কৌশলে নিমাই জমিদারকেও আদালতে হেনস্তার হাত থেকে রেহাই দেয়নি।

যাইহোক, নবীনের ক্রোকি পরোয়ানার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর বাড়ীর ক্রোকি পরোয়ানা নিয়ে আদালতের পেয়াদা এসে উপস্থিত। নিমাইয়ের অবস্থা সঙ্গীন। সে হল নিরুদ্দেশ। নানা জায়গায় ঘুরে জানতে পারল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে পদ্মাবোটে রয়েছেন। রবিবাবুকে প্রাণের দুঃখের কথা বলার জন্য গভীর রাতে জীবন-মরণ পণ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল দুরন্ত পদ্মায়। সাঁতরে বোটের কাছে এসে পিঠ দিয়ে সেটাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে হাঁপিয়ে সে প্রায় অজ্ঞান। দোলা খেয়ে রবীন্দ্রনাথ চমকে কামরার বাইরে এসে ভূত দেখার মতো ওকে দেখে একটু সামলে নিয়ে ভেতরে ডেকে এনে ব্যথিত চিত্তে সব শুনে খুবই চিন্তিত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচাবার কথা দিলেন।

সেই মাঝ রাতেই চিঠি পেয়ে পরদিন ভোরবেলাই ম্যানেজারবাবু রেগে আগুন ছড়াতে ছড়াতে নিমাই সংক্রান্ত কাগজপত্র বাবুমশাইকে দেখাচ্ছেন আর বলছেন: "কৃষি ব্যাঙ্কের দেনা আর বাকি খাজনার দেনা, সুদে আসলে ছ'শো টাকার ওপর তার কাছে পাওনা।" রবীন্দ্রনাথ সব মন দিয়ে শুনে বললেন: "এ মানুষটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। এর এমন পয়সা নেই যে দুবেলা খায়। চাষের জমিটা খাস দখলে আনলে একে সপরিবারে মেরে ফেলা হবে। এই ভাবেই পল্লীর অশিক্ষিত লোক সব উচ্ছন্নে গেল। এ টাকা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।"

ম্যানেজার যত বলে রবীন্দ্রনাথ ততই বলেন যে, পাপের ফল বেশ ভুগেছে, সব টাকা মাপ করে দিতে হবে এবং জমিটাও দিতে হবে।

শেষকালে নিমাইকে ডেকে তিনি নিজেই বললেন: "শোন্ তোর সব টাকা মাপ করে দিলাম, জমিও ফিরিয়ে দিলাম, কিন্তু বাপু, খাঁটি লক্ষ্মীমন্ত চাষী হতে হবে। আমি আর একবার এসে যেন দেখতে পাই, নিমাইয়ের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু। চাষে মন দিলেই সব দুষ্টুমি চলে যাবে। নইলে আবার সব কেড়ে নেব কিন্তু।" এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ। নিমাইও অবশ্য বাবুমশাইয়ের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

তাহলে আমরা দেখলাম যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হলেও দরদী জমিদার। প্রজাদের শুভাশুভ চিন্তাও তাঁকে করতে হয়। তাই প্রজারা ঐ "পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক"কে যাতে বহুরকম ভাবে কাজে লাগাতে পারে সেটা তিনি সর্বদাই যে ভাবতেন তার প্রমাণ আমরা পাই পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি চিঠি পড়ে: "বোলপুরে একটা ধানভানা কল চলছে—সেইরকম একটা কল এখানে (পতিসরে) আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে।···এখানকার অনেক চাষায় মিলে এই কলটা যদি চালায় তাহলেই ওদের মধ্যে মিলে কাজ করবার যথার্থ সূত্রপাত হতে পারে। আমাদের ব্যাঙ্ক (পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক) থেকে ধার দিয়ে এই ধানভানার ব্যবসাটা এখানে সহজেই চালানো যেতে পারে···।"

ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে, কতখানি আত্মবিশ্বাস ও আত্মিক শক্তি রবীন্দ্রনাথের ছিল যে, গ্রাম্য মহাজনদের কবল থেকে হতভাগ্য চাষীদের উদ্ধারের জন্য ঐ ইংরেজ আমলেও তিনি একটি বেসরকারী অরেজিস্ট্রীকৃত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। সুপরিচালনার অভাবে ঐ ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য সফল হতে পারল না। আমানতকারীদের টাকার জন্য দারুণ তাগাদা আসছে। তবু রবীন্দ্রনাথ লড়ে যাচ্ছেন। "শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ" বইতে শচীন অধিকারী লিখেছেন: "এই ব্যাঙ্ক প্রায় ত্রিশ বছর বেঁচেছিল। পরে এই ব্যাঙ্কের শেষ চিহ্ন ছিল শান্তিনিকেতন কল্যাণকোষে।" তবে Rural Indedtedness—এর আইন প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষি ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। প্রজাদের ঋণ দেওয়া টাকা আর আদায় করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, নোবেল পুরস্কারের আসল

টাকাও তাই শেষ অবধি কৃষি ব্যাঙ্ক বিশ্বভারতীকে ফেরৎ দিতে পারেনি।

আজকাল দিকে দিকে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বেশ বিস্তার লাভ করছে। নিঃসন্দেহে খুব প্রশংসনীয় উদ্যোগ এটা। রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই সমবায় মারফৎ গ্রামের সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা ভেবেছেন এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকার সুব্যবস্থা করার কথা যেভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং অনেকাংশে বাস্তবায়িত করতেও পেরেছিলেন—সেটাই যে গ্রামোন্নয়নের শ্রেষ্ঠ উপায়, রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদগণ আজ তা স্বীকার করছেন। এইটি অত্যন্ত আনন্দের কথা। এতে আরো আশা মনে আসে যে, এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি দিয়ে আমরা যে সাধনা শুরু করেছি তাতে সিদ্ধি লাভ করে দিনে দিনে ঐ সকল কাজে সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠব।

রবীন্দ্রনাথ ও হ্যামিলটন

"Villages are like women. In their keeping is the cradle of the race."

—**Rabindranath Tagore**

রবীন্দ্রনাথ নিছক কাব্যবিলাসই করেননি। দেশের বাস্তব সমস্যায় বিচলিত হয়ে দেশসেবার কাজেও নেমেছিলেন তিনি। আর তাঁর মতে দেশসেবা হল গ্রামসেবা। তিনি বুঝেছিলেন গ্রামই ভারতের প্রাণ। গ্রামকে না বাঁচাতে পারলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না। তাই প্রথমে নিজের জমিদারী শিলাইদহ-পতিসরে এবং পরে শান্তিনিকেতনে বিস্তৃত হয় কবির কর্মক্ষেত্র।

১৯১৫ সালে শিলাইদহ হল হাত ছাড়া। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠা হয় বিশ্বভারতীর। আর শ্রীনিকেতন সৃষ্টি হল ১৯২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। কালীমোহন ঘোষ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে এল. কে. এলমহার্ষ্ট নিলেন তার দায়িত্ব। এইভাবে সুরুলের শ্রীনিকেতন কুঠিবাড়িতে গ্রাম পুনর্গঠন কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের বহুআকাঙ্ক্ষিত গ্রামসেবার একটা মোটামুটি পাকাপাকি ব্যবস্থা হল। দেশের কাজ বলতে তিনি যা বুঝতেন তারই মূর্তিদানের উদ্দেশ্যে এই শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা। তাই শিলাইদহের সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা নিয়ে নবোদ্যমে আরম্ভ হল নব কর্মযজ্ঞের।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শিলাইদহ ও কুষ্টিয়ায় তাঁত-শালা গড়ে উঠেছিল। কালিগ্রাম পরগণায় হিতৈষী সভা গঠিত হয়ে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে। আবার রাস্তা তৈরী, পুকুর সংস্কার, কূপখনন, ধর্মশালা ও কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজও কম হয়নি। তারপর শ্রীনিকেতনে একে একে গড়ে উঠেছে কৃষিখামার, ফলবাগান, মুরগী ও গোপালনকেন্দ্র, চামড়া ও তাঁতশিল্প কেন্দ্র ইত্যাদি। এছাড়া স্থাপিত

হয়েছে চিকিৎসালয়। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছে স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি ও ব্রতীবালক সংগঠন। আবার স্থাপিত হয় শিক্ষাসত্র, লোকশিক্ষা সংসদ, শিক্ষা-চর্চা, সমবায় ভাণ্ডার, বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামসেবার আদর্শই হল সমবায়ের নীতিতে গ্রামবাসীদের সুসংবদ্ধ করে তাঁদের সমবেত উদ্যমে গ্রামের কৃষি উন্নয়ন, পশুপালন, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করে তাঁদের সুস্থ, সবল, সমৃদ্ধ, সম্মানিত ও শোষণমুক্ত করে পল্লীসমাজকে দেশমাতৃকার সক্রিয় ও সচেতন অঙ্গহিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আর এই আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করার প্রয়াসে যেখানে তিনি গ্রামোন্নয়নের কোন কাজের কথা শুনেছেন ছুটে গিয়ে সেখান থেকেই অভিজ্ঞতা অর্জন করে এনে তাঁর কর্মভূমিতে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা করেছেন।

কত জায়গায় যে গেছেন রবীন্দ্রনাথ তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পড়েছে তাঁর পায়ের চিহ্ন। ভারতের কত কোণে করেছেন তিনি ভ্রমণ, ঘুরেছেন বাংলার নানা গ্রামে গ্রামান্তরে। এইরকমই একদিন গিয়েছিলেন তিনি স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটন সাহেবের সাদর আমন্ত্রণে তাঁর সুন্দরবন অঞ্চলের গোসাবা পল্লীকেন্দ্র দেখে আসার জন্য।

কিন্তু কে এই হ্যামিলটন সাহেবটি? ইনি আর কেউ নন, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশে দ্বীপময় গোসাবা ব্লকের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে যাঁর নাম মিশে রয়েছে ইনি তিনিই। প্রায় শতাব্দীকাল আগে সুদূর স্কটল্যাণ্ড থেকে ইংরেজ সরকারের উচপদস্থ কর্মচারী হিসাবে চাকরী নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তিনি। ভালবেসে ফেলেন এখানকার দীনদুঃখী মানুষদের। প্রাণ কাঁদে এদের জন্য কিছু করার। তাই চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করে সারা জীবনের সঞ্চয় নিয়ে এই ধনী, সহৃদয়, সাহসী সমাজসেবী মানুষটি চলে যান সুন্দরবনে। Co-operative Common Wealth-এর মাধ্যমে নিজের চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার মানসে তিনি ১৯০৩ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে সুন্দরবনের গোসাবা, সাতজেলিয়া ও রাঙ্গাবেলিয়া নামে লাগালাগি তিনটি দ্বীপ ইজারা নিয়ে কাজে লেগে যান।

স্কটল্যাণ্ডের এই ধনী মনীষী স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন উত্তাল বিদ্যাধরী নদীর ধারে প্রথমে দুর্গম শ্বাপদ-সঙ্কুল বন কেটে করলেন বসতি। সর্বপ্রথম সাঁওতালদের হাজারিবাগ ও রাঁচি অঞ্চল থেকে আনলেন। তারপর আনলেন দিশি খৃষ্টানদের এবং সবশেষে মেদিনীপুরের হিন্দুরা দলে দলে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এসে বসবাস করতে শুরু করে দেয়। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ যতটা আকর্ষণ করেছিল তার তুলনায় বোধহয় ওখানকার মানুষের অপরিসীম দারিদ্র্য প্রবলভাবে টান দিয়েছিল তাঁর মতো মানবদরদী মানুষের মহান হৃদয়কে।

আমরা জানি গোসাবা দ্বীপটি হচ্ছে জলপথে ক্যানিং থেকে ৪৫ কিঃ মিঃ দূরে গোমর ও বিদ্যাধরী নদী পরিবেষ্টিত সুন্দরবনের সিংহদ্বার। ছোটখাটো আরো গোটা ১৪টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত গোসাবা ব্লক। সুন্দরবনাঞ্চলের ঘন নিবিড় জঙ্গল, রাজকীয় বাঘ, বিষাক্ত সাপ, বীভৎস কুমীর, মৌমাছির হুলের জ্বালা আর নোনা জলের মাঝেই এখানকার সাদাসিধে মানুষগুলো প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সমানে যুঝে শুধু প্রাণ ধারণের, শুধু দিন যাপনের গ্লানি ভোগ করে চলেছে। আর এইরকম সরল অসহায় লোকগুলোর দিকেই প্রথম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সাগরপারের ঐ মহামানব স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন।

অর্থনীতির ওপর এক নূতন আদর্শ ও চিন্তাধারা পোষণ করতেন স্যার হ্যামিলটন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর দেশের আদর্শানুযায়ী বাংলায় সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে। অনবরত এদেশের দরিদ্র অর্থনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন তিনি। তিনি বুঝেছিলেন যে, এরকম কৃষিপ্রধান অর্থনীতির উন্নতির জন্য জোর দেওয়া উচিত গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর, যার মেরুদণ্ড হচ্ছে সমবায়—ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন। আর দেশের যুবশক্তিকে চাকরীর বদলে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তুলে এতে অংশ গ্রহণ করাবার ব্যাপারে ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। এই কাজে সফলতার জন্য তিনি অনুশীলন সমিতিকে এক কোটি টাকা দান করতে চেয়েছিলেন। স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর একটি ভাষণে তিনি তাঁর গ্রামোন্নয়ন

পরিকল্পনার যে সব কর্মসূচীর উল্লেখ করেন তাতে গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য পঞ্চায়েত পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে গোসাবায় তার প্রবর্তনে উদ্যোগী হবার কথা উল্লেখ করেন: "The village people will relearn the art of Self-Government and resuscitate the old village republic as they are doing in Gosaba." তিনি মনে করতেন যে, যে অর্থনীতি কায়িক শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সেটাই সবচেয়ে খাঁটি। রবীন্দ্রনাথও ঠিক একই ধারণা পোষণ করতেন।

১৯০৮ সালটি বাংলাদেশের কাছে এক নবজাগরণের কাল। সেই সময় হ্যামিলটন সাহেব সুন্দরবনে কৃষিকাজকে একটা লাভজনক জীবিকা বলে প্রমাণ করে বাঙ্গালী যুবকদের চাকরীর বদলে ঐ দিকে টানতে চেষ্টা করেন। তখনকার হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের মতো ব্যক্তিও তাঁর হরিপালের জমি চাষের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই ব্যাপারটিকে সমর্থন করেন। তখন সরকার সমবায় সংক্রান্ত আইন পাশ করেছেন। সেই সুযোগে হ্যামিলটন সাহেবের সহৃদয় সহায়তায় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ১৯০৯ সালে "বেঙ্গল ইয়ংমেনস্ জমিনদারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" প্রতিষ্ঠা করেন। এটি প্রধানতঃ অনুশীলন সমিতির সদস্য-দের নিয়েই গঠিত হয়েছিল।

বাঙ্গালী যুবকদের হ্যামিলটন সর্বদা উপদেশ দিতেন স্বাবলম্বী হতে। পরমুখাপেক্ষী হয়ে চাকরী করার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তবে তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝেছিলেন যে, উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার না হলে কিছুই সম্ভব নয়। অতএব আপ্রাণ চেষ্টা করে তিনি অশিক্ষিত লোকগুলিকে উপযুক্ত ভাবেই বোঝাতে পেরেছিলেন যে, যুবসম্প্রদায়কে শিক্ষিত করে পরিপূর্ণ সমবায়-ভিত্তিক শ্রম বিনিময়ের ভেতর দিয়েই সম্ভব হবে ভারত-বর্ষের মতো সমস্যা-সঙ্কুল বিরাট দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি। তিনি দাবী করেন যে, তাঁর পরিকল্পনার কর্মসূচী সুষ্ঠু ব্যাঙ্কিংনীতির ভিত্তিতে রচিত। তিনি ১৪টি কর্মসূচী নিতে চেয়েছিলেন এবং সেগুলি রূপায়ণে মহাত্মা গান্ধীর যথেষ্ট স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন। ঐগুলির মধ্যে অবশ্য ৮টি

কর্মসূচীই বিশেষরূপে স্থান পায়, যেগুলির রূপায়ণ সমবায়ের ভাবাদর্শকে সাধারণ মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

এইভাবে আমরা দেখি যে, সবরকম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্বেও হ্যামিলটনের আন্তরিক সাহচর্যে ১৯০৯ সালে গোসাবায় প্রতিষ্ঠিত হল "Bengal Youngmen's Zamindary Co-operative Society" নামে ভারতবর্ষের প্রথম যুগের একটি সমবায় সংস্থা। তাঁর সহায়তায় ওখানকার চাষীভাইরা গড়ে তুলেছিলেন আরো অনেকগুলি সমবায় সমিতি। ব্যবস্থা হল ধান ও মাছের একত্র চাষের। শুরু হয় Cross-breeding-এর মাধ্যমে গরুর জাত বদল এবং তা গোসাবা থেকে বাইরেও চালান যেতে থাকে। প্রতি ৮ থেকে ১০টি গ্রামের জন্য একটি করে দাতব্য চিকিৎসালয় বসানো হয়েছে। ধুতি, শাড়ী, গামছা, মশারী প্রভৃতির জন্য গ্রামে গ্রামে স্থাপিত হল তাঁত। আর শিক্ষার জন্য খোলা হয় সব গ্রামে Lower Primary School এবং গোসাবায় Rural Reconstruction School। ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা গিয়েছিল বাংলার তথা ভারতের অন্যত্র যখন তেলের আলো টিম টিম করে জ্বলছে গোসাবা তখন বিজলী বাতিতে ঝলমল, চক্ চক্ করছে তার সুন্দর পাকা রাস্তা, ছবির মতো সাজানো রয়েছে কর্মীদের জন্য কাঠের বাড়ী।

১৯৩১ সালের আদমসুমারিতে দেখা যায় সারা বাংলায় যখন শিক্ষিতের হার মাত্র ৪% তখন গোসাবায় ৪৫%। ওখানে হ্যামিলটন এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন, যা মানুষকে শিশুকাল থেকেই সততা-বোধে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করবে। এ ব্যাপারে ১৯৩৭ সালের ৫ই মার্চ তাঁরই এষ্টেটের তদানীন্তন ম্যানেজার শ্রীসুধাংশু ভূষণ মজুমদারকে লেখা তাঁরই একটা চিঠির একটু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "...the only way to get honest men is to train them to be honest from their childhood...and Gosaba should give a lead in manufacture of good men rather than in making money." রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রভৃতির মতো মনীষীরা স্বাগত জানিয়ে-

ছিলেন এই বিদেশী মহামানবের পরিকল্পনাকে। এই পরিকল্পনা নিয়ে এঁদের মধ্যে প্রায়ই পত্র বিনিময় হত।

এই প্রসঙ্গে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। ১৯১৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বম্বে প্রাদেশিক সমবায় সম্মেলন সূত্রে গান্ধীজীর মন্তব্য: "With Sir Daniel Hamilton it has become a religion…, in order to point a moral, he instanced Scotland's poverty of two hundred years ago and showed how that great country was raised from a condition of poverty to plenty."

এই হ্যামিলটন সাহেবই রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে সমবায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে জবাবে জানিয়েছিলেন. "I have not the least doubt in my mind that the Co-operative method of production and distribution of wealth is the only means of effecting the economic salvation of India, and inspite of limited resources and experience I have been trying to introduce it among the villagers in our neighbourhood. And therefore, I heartily welcome your suggestion for establishing centre of training of young men for the Co-operative Department of Government, in Santiniketan."

রবীন্দ্রনাথ স্যার হ্যামিলটনের কাজকর্মের সাফল্যের সব খোঁজ খবর রাখতেন। তাই শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবের শেষে বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে (৯ ও ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯) সভাপতি করে আনেন স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনকে যিনি বলেন: "If Co-operation fails the hope of all India will fail." সভার উদ্বোধন করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "আজ

ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারত-সভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে।" ঐ সময়ই হ্যামিলটন সাহেব রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সুন্দরবন অঞ্চলের গোসাবা পল্লীকেন্দ্র দেখে আসার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে যান। সে আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণও করেন রবীন্দ্রনাথ। তবে তখনি তা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

এদিকে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে নদীর স্রোতের মতো বয়ে যায় বছর তিনেক। হঠাৎ একদিন কোলকাতায় একটা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে এলে হ্যামিলটনের লোক এসে রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয় তাঁর গোসাবার আমন্ত্রণের কথা। অতএব আর দেরী না করে ১৯৩২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হন হ্যামিলটন সাহেবের প্রধান কর্মকেন্দ্র গোসাবায়।

রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তৈরী হয়েই ছিল গোসাবা। হ্যমিলটন বাংলা বলতে পারতেন। নবীনচন্দ্র দে নামে স্থানীয় এক প্রভাবশীল লোককে তিনি বললেন: "মহাকবি আসছেন গোসাবায়, আদর যত্নের ত্রুটি যেন না হয়।" নবীনবাবু আয়োজন করলেন রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করার। হ্যমিলটনের বাংলোর সামনে সভা হল। সে সভায় নবীনবাবুর কন্যা শান্তি গাইলেন এমন একটি গান যেটা রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানিয়ে নবীনবাবুরই পুত্র সুধাংশুর রচিত ও সুরারোপিত। রবীন্দ্রনাথ শুনে প্রশংসা করলেন কিশোরী গায়িকাকে।

অভ্যর্থনা সভা সাঙ্গ হলে রবীন্দ্রনাথকে থাকতে দেওয়া হল হ্যামিলটন সাহেবের একতলা—সমান উচু বাংলো বাড়ীতে। ঐ রাতে তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছিল গোসাবার কৃষিক্ষেত্রের বিশাল মর্তমান কলা এবং মাতলা নদীর উৎকৃষ্ট ভেটকি মাছ। খাওয়াদাওয়ার পর বহুক্ষণ ধরে বাংলোর জানালা দিয়ে তিনি উপভোগ করেছিলেন অরণ্যের আদিম অন্ধকার। পুরো ছুটো দিন তিনি সেখানে থেকে ক্ষেতখামার, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি সাহেবের লাটের বিভিন্ন কেন্দ্র সাগ্রহে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিদর্শন

করে সমবায়ের বাস্তবায়িত রূপ দেখে মুগ্ধ হন। ঐ অঞ্চলের মানুষ তখন তাঁকে গোসাবার তাঁতশালায় তৈরী একটি উৎকৃষ্ট পশমের শাল উপহার দিয়েছিল। গোসাবার অভিজ্ঞতা শ্রীনিকেতনে কাজে লাগাবেন এই আশা মনে গেঁথে নিয়ে তিনি ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি গোসাবার লঞ্চঘাটে এসে মোটর লঞ্চে উঠলেন। তখন সাহেবের লাটের সমস্ত মানুষ ঐ ঘাটে এসে জমা হয়ে বিদায় জানাচ্ছে ঐ দিব্যকান্তি মহাপুরুষকে। সুন্দরবনের ইতিহাসের এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

এখন সেই সাহেবও নেই, নেই সেই গোসাবাও। ১৯৩৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর সাহেব গেলেন কবরে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল গোসাবার গৌরব তথা সুন্দরবনের সৌন্দর্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষোদ্গারে সমবায় আদর্শের মধ্যে ঢুকল ব্যক্তিগত স্বার্থের গন্ধ। চিড় খেল সমবায় আন্দোলনের গাঁথুনি। রাজনৈতিক জুয়াখেলায় সমবায় সমিতির মধ্যে শুরু হল নোংরা দলাদলি। গোসাবার বুকে নেমে এল অন্ধকার।

আমরা জানি হ্যামিলটন সাহেব মৃত্যুর পূর্বে উইল করে তাঁর তাবৎ ভারতীয় সম্পত্তি গোসাবা ও অনুরূপ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য দান করে যান। নেই সেই সাহেব, নেই গোসাবার সেই রোশনাই। আছে কিন্তু তাঁর সেই পুণ্য বাসগৃহটি। অতিথিশালা হিসেবে পরিচিত হয়ে প্রতি পদে পদেই সে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই মহাপ্রাণ সাহেবের গ্রামোন্নয়নের বহুমুখী কর্মযজ্ঞের কথা। তখনকার গতি আজ নানা সমস্যায় সেরকম না এলেও ঐ স্মৃতিকে ঘিরেই গোসাবায় আবার ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে নূতন জীবন।

আর এদিকে মাত্র বছর দুয়েক পর ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথও বিশ্ব থেকে বিদায় নিলেন এবং তারপর নানান উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলেছে বিশ্বভারতী। আজ অবশ্য বহু পরিকল্পনা ও প্রত্যাশারও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তবে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে সেগুলি সেদিনের সুন্দর সংস্কার পরিচয় কতটা বহন করবে কে জানে! অতএব আমাদেব প্রত্যেকেরই উচিত এই দুই মনীষীর কীর্তিভূমির মর্যাদা যাতে রক্ষিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

॥ আট ॥

রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন

"গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধুলায় রে॥"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রামোন্নয়ন কর্মযজ্ঞের অন্তরঙ্গ সহায়ক হিসেবে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী করে যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি হলেন কালীমোহন ঘোষ। তাঁর জন্ম হয় ১৮৮৪ সালে অবিভক্ত বাংলাদেশের ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর শহরের মাইল ছয়েক দক্ষিণ দিকে মেঘনা নদীর পূর্ব পাড়ে কয়েক মাইল ভেতরে বাজাপ্তী নামে এক গ্রামে। ছেলেবেলায় তিনি খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করেন। কলেজে পড়তে পড়তে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কিছুদিন পরে কলেজ ছেড়ে দিয়ে শরীর অগ্রাহ্য করে অত্যুৎসাহের সঙ্গে তিনি মেতে ওঠেন পূর্ববঙ্গের গ্রাম-গঞ্জ-শহর ঘুরে বেড়িয়ে বিদেশী শাসন-বিরোধী ও বিলাতী জিনিসপত্র পরিত্যাগের প্রচারকার্যে।

এইভাবে কালীমোহন সরল, মূর্খ, গরীব গ্রামবাসীদের একান্ত আপনজন ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে থাকেন। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় ঠিকই বলেছেন :···"শুনিলাম একদল স্বদেশী প্রচারক গ্রামে আসিয়াছেন।··· সকলের মধ্যে দেখিলাম কালীমোহন ঘোষই যেন প্রাণস্বরূপ। শরীরে কিছুই নাই, অথচ উৎসাহে পরিপূর্ণ চিত্ত, তাহারই সাক্ষ্য দিবার উপযুক্ত দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু।···কালীমোহনের সঙ্গে আলাপ হইল, বড় ভাল লাগিল। দেখিলাম এই উৎসাহমাত্র সম্বল যুবকটির শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন।···কিন্তু অবসর ও বিশ্রাম লইবার মতো ধৈর্য কালীমোহনের নাই।···গ্রামের মায়েরা কালীমোহনকে ইতিমধ্যে ঘরের ছেলের মতো করিয়া লইয়াছেন।"

আমরা শুনেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯০৩ সাল থেকেই বিভিন্ন বক্তৃতা দিয়ে, গরম গরম গান গেয়ে এবং প্রেরণাদায়ক

প্রবন্ধ লিখে তাঁর নিজস্ব গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মপদ্ধতির কথা প্রচার করছিলেন বাঙ্গালীদের মধ্যে। সেইসময় কিভাবে কালীমোহন ঘোষ রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে ঐ বিরাট কর্মযজ্ঞের সহযোগী হিসেবে কাজ শুরু করেন তার সুন্দর বিবরণ পাই কালীমোহন-পুত্র স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী শান্তিদেব ঘোষের স্মৃতিচারণে: "পিতৃদেব এভাবে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাজে যুক্ত তখন গুরুদেবের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। তিনি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করেন। উভয়ের মধ্যে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনাও হয়। পিতৃদেবের স্বদেশপ্রেমের পরিচয়ে আকৃষ্ট হয়ে, গুরুদেব তাঁকে প্রস্তাব দেন, 'স্বদেশী সমাজ'-এ উল্লিখিত কার্যসূচী অবলম্বনে, তিনি তাঁর জমিদারীতে, গ্রামবাসীদের মধ্যে যে উন্নয়নমূলক কাজ করবেন বলে স্থির করেছেন, তাতে যোগ দেবার জন্য। পিতৃদেব সানন্দে সম্মতি দেন, এবং ১৯০৬ সালে গুরুদেবের নির্দেশ মত, জমিদারীতে পল্লীবাসীদের মধ্যে নানাপ্রকার উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেন।"

এইরকম করে কালীমোহন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জনসেবার সুন্দর সুযোগ পেলেন। তখনও শ্রীনিকেতনে জনসেবা-বিভাগ শুরু হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের জমিদারী শিলাইদহে জনসেবার কাজ চলছিল। সেখানেই রচিত হল কালীমোহনের কাজের ক্ষেত্র। তিনি নেমে পড়লেন সেই কর্মক্ষেত্রে কোমর বেঁধে। কঠোর কর্মযোগে শরীর তাঁর ভেঙ্গে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে নিয়ে এলেন শান্তিনিকেতনে। এখানে শিশুদের শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হলেন। জিতে নিলেন শিশুমন। অথচ আসল আর্কষণ তাঁর গ্রামোন্নয়নের দিকে। ছাত্রাবস্থাতেই চতুর্দিকের গ্রামের মানুষদের দুঃখ-দুর্দ্দশা অন্যায়-অবিচারের কথায় অস্থির হয়ে উঠতেন তিনি। তাই শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত অবস্থাতেই বিদ্যালয়ের বয়স্ক কিছু ছাত্রদের ছোট ছোট দল নিয়ে অবসর সময়ে বিকেলে, সন্ধ্যায় বা ছুটির দিনে কাছা-কাছি সাঁওতাল পল্লী বা ভুবনডাঙ্গা গ্রামের গরীবদের মধ্যে উন্নয়মমূলক কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

১৯১৩ সালের পর পিয়ারসন সাহেবকে সহায়ক রূপে পেয়েছিলেন

কালীমোহন বাবু এই গ্রামোন্নয়নের কাজে। এই প্রসঙ্গে প্রমদারঞ্জন ঘোষের বিবৃতি স্মরণীয়ঃ "রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুসারে সেকালে শান্তিনিকেতনের কয়েকটি প্রাণবান ছেলে বিকালে নিজেরা স্কুলের অপর ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলায় যোগ না দিয়ে নিকটবর্তী সাঁওতালপল্লীর ছেলেদের লেখা-পড়া শেখাবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল, সাঁওতাল ছেলেদের সঙ্গে তারা ফুটবল খেলতো ও তাদের খেলা শেখাতো। এ কাজে পিয়ার্সন ও স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ ছিলেন ছেলেদের প্রধান উৎসাহদাতা। কয়েকটি সাঁওতাল ছেলে নিয়মিত ক্লাশ করতো এবং পড়াশুনায় বেশ অগ্রসর হয়েছিল।" এ সম্পর্কে পিয়ারসন সাহেবেরও সুন্দর স্মৃতিঃ "সাঁওতাল আদিবাসীরা শান্তিনিকেতনের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। তাদেরই একটি গ্রামে আদ্যবিভাগের ছাত্রেরা একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছে। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে আমরা সে গ্রাম পর্যন্ত ঘুরে এলাম।" যতদূর মনে হয়, ঐ গ্রামটিই পরে "পিয়ারসন পল্লী" নামে পরিচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনকে ইউরোপে পাঠিয়ে সেখানকার বিশিষ্ট লোকশিক্ষাব্রতীদের সংস্পর্শে থাকার সুযোগ করে দেন। তিনি সে সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দেশে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনেই আবার কাজে লেগে যান। কিছুদিন পরে যখন শ্রীনিকেতনে জনসেবামুলক কাজের রীতিমত ব্যবস্থা হয়, তখন তাঁকে সেখানে যেতে হল। আর সেখানেই সত্যি-কারের সুযোগ পেলেন তিনি গ্রামোন্নয়নের কাজের। এই কাজেই তাঁর নিজস্ব প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরণের সূচনা হয়। দিকে দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রামসেবকরা তাঁর কাছে কাজ শিখতে আসতে থাকে।

এই সুযোগে সর্বতোভাবে বিভিন্ন জাতীয় অবিচার, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কালীমোহন নিজে যে রুখে দাঁড়িয়েছেন তেমনি অপরকেও তা শিখিয়ে গেছেন। এইসব ব্যাপারে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পড়া যাকঃ "বছর কয়েক আগেই গুরুদেব সুরুলের কুঠিবাড়ী ও তৎসংলগ্ন কয়েক বিঘা জমি ক্রয় করেছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টিকেই পূর্ণতর রূপ

দেবার কথা চিন্তা করে, এখন তা শান্তিনিকেতন-বাসীর বুঝতে বাকি রইল না। বিলাত থেকে অবিলম্বে এসে পৌঁছলেন কৃষিবিদ তরুণ ইংরাজ যুবা এল, কে, এলম্‌হার্ষ্ট (লেনার্ড নাইট এলম্‌হার্ষ্ট)। এসেই কালীমোহনবাবুকে তিনি ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন আমাদের মধ্য থেকে। সেই সঙ্গে সন্তোষ মজুমদার প্রমুখ আরও অনেককেই নিলেন।...বস্তুত কালীমোহনবাবুকে ছিনিয়ে নিতে হয় নি—কাদায় পড়ে থাকা জলের মাছ যেন তার জলে ফেরার সুযোগ পেল।"

একথা ঠিকই যে, শ্রীনিকেতন ছিল কালীমোহন ঘোষের মনের মতো কাজের জায়গা। আর তাঁর মতো কর্মী এবং এলম্‌হার্ষ্ট সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অর্থই ছিল রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন প্রকল্পের প্রধান সহায়। তাই ১৯২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী যখন রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে সুরুল গ্রামের পাশে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে প্রস্তুত তখন পল্লীসেবা বিভাগের পরিচালকের পূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছেন কালীমোহন ঘোষ। তিনি নিজেই লিখেছেন: "Rabindranath desired that I should put my shoulder to the wheel; for this we should make the house purchased from Lord Sinha in the village Surul the centre of all constructive activities ." আর এই গঠনমূলক কাজ হাতে নিয়েই তিনি গরীব গ্রামবাসীদের মধ্যে সমবায় প্রথায় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিবিধ অর্থনৈতিক উন্নতির দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তাব পেশ করতে থাকেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। ক্রমে তাঁর নির্দেশানুযায়ী কাজে অগ্রসর হন।

ভেবে অবাক হতে হয় যে, এই কালীমোহনবাবুই বীরভূম জেলার অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ভেতর নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার আশা-আকাঙ্ক্ষার আলো জ্বালাতে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। বীরভূমের তপসীলী শ্রেণীর কর্মী এবং বিধান সভার পূর্বতন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী স্বর্গত নিশাপতি মাঝি এই কালীমোহন ঘোষেরই নিজের হাতে তৈরী মানুষ ছিলেন। আর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি তাঁর নিজেরই অঞ্চলে স্থাপন

করে গেছেন "কালীমোহন ভবন"। এই সমস্ত কাজে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ এবং গ্রামের জমিদার ও জোতদার মহাজনদের স্বার্থপরতা ও উদাসীনতা যে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কালী-মোহনের নিজের লেখা পড়েই: "বল্লভপুরের পল্লীপরীক্ষণের কাজে ব্যাপৃত থাকার সময়ও এদের সমস্যাগুলির সম্বন্ধে যখন ভাবিত হইয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, পল্লীসমাজের ধ্বংসের প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় এবং ধনী মহাজন ও জমিদার তালুকদারগণের উদাসীনতা ও স্বার্থপরতা।" অবশ্য এই বিরোধিতা ও বাধার ভাব দূর করতে শেষ অবধি সমর্থ হয়েছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার হয়েও জমিদারী প্রথার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। নিজের জমিদারীর প্রজাদের তিনি অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে রাখেননি বা অত্যাচার করেননি। উপরন্তু আত্মীয়ের মতো আপন করে নিয়েছেন। তাদের সুখদুঃখের সমব্যথী হয়েছেন। শ্রীনিকেতন স্থাপন করার পর আবার সেখানকার চারদিকের গরীব গ্রামবাসীদের জন্য তাঁর কি গভীর দরদ এবং তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য কত না চিন্তা তাঁর।

গ্রামবাসীদের প্রতি পিতার মতো সস্নেহ সহানুভূতির সঙ্গে গ্রামের ভবিষ্যৎ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে কত চিন্তা ছিল সেটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে অতি সম্প্রতি যীশু চৌধুরীর নেওয়া শান্তিনিকেতন—শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন কর্মী ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক সাক্ষাৎকার থেকে: "একবার গ্রামের একটি কৃষকের ছেলে নিউমোনিয়ায় পড়ল। তখনকার দিনে নিউমোনিয়া সারানো বেশ কঠিন ছিল। আমি তো দিনরাত পড়ে থাকতাম সেখানে। তারপর ধীরে ধীরে একদিন ছেলেটি ভাল হয়ে গেল। কেমন আছে সে খবর নেবার জন্য আর একদিন গ্রামে ঢুকেছি। ঐ ছেলেটির বাড়ীর কাছাকাছি যেতে শুনি ভেতর থেকে কথা আসছে। হ্যাঁ, ভারি তো চার পয়সা ফিজের ডাক্তার, ও আবার নিউমোনিয়া সারাবে। এমনিতেই সেরে গেছে। মন খুব খারাপ হয়ে গেল। একদিন গুরুদেব ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী বুঝছ, গ্রামের প্রসপেক্ট কেমন হবে? আমি বললাম, এদের

কিস্স্যু হবে না। গুরুদেব বললেন, কেন? আমি তখন সেদিনের কথাটা বললাম। এরা এত অকৃতজ্ঞ যে…। গুরুদেব বললেন, নিজের ভাল যে বোঝে না তার ওপর রাগ করাও চলে না।”

কালীমোহন ঘোষও যে রবীন্দ্রনাথের মতো ঐ রকম জমিদারী বিদ্বেষী এবং দরিদ্র গ্রামবাসী দরদী ছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায় যীশুবাবুর গৃহীত ঐ সময়কারই সাক্ষাৎকার থেকে। তবে সেটি ছিল শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের পুরানো কর্মী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেখানে তিনি বলেন: “সে ১৯৩৪ সালের কথা। আমার কাজ ছিল কালীমোহন ঘোষ, গৌরগোপাল ঘোষ, এলমহার্স্টের অধীনে।… রবীন্দ্রনাথ দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখতেন না, দেখতেন রথীবাবু। রথীবাবু ছিলেন দারুণ পরিশ্রমী লোক। কী উদার। সব সময়ই কিছু না কিছু একটা কাজ করছেনই। সব সমস্যা মেটাতে পারতেন তিনি। একবার ঠিককরলেন, সাঁওতালদের কাছ থেকে কিছু কিছু আদায় করা হবে। আমি রেট চার্ট জানালাম। তাই দেখে কালীমোহনবাবু ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন, তুমি জমিদারি মেজাজে সব চালাবার চেষ্টা করছ। গোমস্তা হয়ে গেছ। পরে উনিই ঠিক করলেন বসত জমির জন্য বছরে চার পয়সা আর বাগান থাকলে বছরে দু পয়সা।”

কর্মযোগী কালীমোহন ঘোষ বেশ ভালভাবেই জানতেন যে, গ্রামোন্নয়নের জন্য গ্রামীণ মানুষদের সমগ্র জীবনকে জানা চাই। এই সূত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তাঁর ১৯২৬ সালে “বল্লভপুর” এবং ১৯৩৩ সালে “রায়পুর” গ্রাম সম্বন্ধে দুটি “তথ্যসংগ্রহ” পুস্তিকা প্রকাশের কথা। এগুলি সম্পর্কে সুকুমার চাটার্জীর প্রশংসা স্মরণীয়: “The survey of two villages has been completed by Babu Kalimohan Ghosh, superintendent of the Institute, and the information has been published in the two booklets. They are full of interesting informations and well worth a perusal.” সবদিক দেখেশুনে তিনি অসহায় গ্রামবাসীদের

সুবিবেচকের মতোই সমবায়নীতি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে শুভকর্মপথে শুরু করেছিলেন যাত্রা। ক্রমে দরিদ্র চাষীভাইদের অবস্থার উন্নতিকল্পে কৃষি সমবায়, ঋণদান ব্যাঙ্ক, ধর্মগোলা প্রভৃতি ছাড়াও শিক্ষা সমবায়, শিল্প সমবায়, স্বাস্থ্য সমবায় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন পল্লী উন্নয়ন বিভাগের কর্মীদের দিয়ে। এছাড়া আবার "ব্রতীবালক" নামে দল গঠন করে, পল্লীবাসীদের সমবেত সহযোগিতায় পল্লীর পথঘাট প্রস্তুত, অস্পৃশ্যতা বর্জন সমিতি ও ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি গঠন, জলা জঙ্গল খানা ডোবা সংস্কার, সালিসী বিচার, লোকসংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিদান প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে হাত দেন। শান্তিনিকেতনের ৭ই পৌষের মেলার সময়কে বাড়িয়ে একদিনের জায়গার দুই দিন করে সেখানে গ্রামোন্নয়নের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

আমরা দেখেছি গ্রামোন্নয়নের কাজে কালীমোহনবাবু সর্বদা সমবায়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও এলমহার্ষ্টের আগ্রহে তিনি দুবার গেছেন বিদেশে পল্লীশিক্ষা, বিশেষতঃ বয়স্কশিক্ষা এবং সমবায় নীতি সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন করতে। এইভাবে উত্তরে স্কাণ্ডিনেভিয়া থেকে দক্ষিণে ইজরাইল অবধি প্রধানতঃ পূর্ব ইউরোপের সমস্ত দেশগুলিতে ঘুরে ঘুরে সেখানকার সমাজে সমবায় কিরকম করে কাজ করছে সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরেন। তারপরে বছরখানেকের ভেতরেই শ্রীনিকেতনের স্বাস্থ্যবিভাগের ডাক্তার ও কর্মীদের সহযোগিতায় "সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি" স্থাপন করে ফেললেন শ্রীনিকেতনের কাছাকাছি গোটা দশেক গ্রামে। যুগোশ্লাভিয়ায় ডাঃ গার্ভিলো কোজিকের প্রবর্তিত স্বাস্থ্য সমবায়গুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মোটামুটি সেই আদর্শেই অবস্থানুসারে সামান্য রদবদল করে কিছু সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি শ্রীনিকেতনের চতুর্দিকে প্রবর্তনে প্রয়াসী হন তিনি।

এইভাবে ১৯৩২ সালে শ্রীনিকেতনের কাছে বাঁদগোড়ায় প্রথম একটি সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি স্থাপিত হয়। সমিতিটি অবশ্য রেজিস্ট্রীকৃত হয় ১৯৩৫ সালে। সম্ভবতঃ সঙ্ঘটির কাজ আজও চলছে। সদস্যদের কাছ থেকে সামান্য

মাসিক চাঁদা নিয়ে বিনা বা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যবীমার নীতিতে নিজ নিজ বাড়ীতে অথবা ডিসপেনসারীতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা, ওষুধপত্র প্রভৃতির সুযোগ দেওয়া হয়। এখানে গ্রীচিন গ্রীণ নামে একজন আমেরিকান ভদ্রমহিলার নাম উল্লেখ করা উচিত, কারণ তাঁরই প্রচেষ্টায় সুরুল গ্রামে একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার ওপর ভিত্তিকরেই কালীমোহন-বাবু বোলপুরের আশেপাশে সমবায় স্বাস্থ্য সমিতিগুলি স্থাপন করেছিলেন। এ ব্যাপারে সাক্ষী স্বয়ং এলমহার্ষ্ট :

"Miss green was to be instrumental in setting up a Village Health Centre and Clinic at Surul. It was with this clinic as a base that Kalimohan Ghosh built his Co-operative Health Societies in the region around Bolpur."

এই এলমহার্ষ্টের সময়ই শ্রীনিকেতনে আসেন আমেরিকা থেকে ঐ মিস গ্রীণ নামে নার্সটি। গ্রামের কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন ননীবালা রায়, যিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় পড়ে এসেছিলেন নার্সিং। কালী-মোহন ঘোষ যে গ্রামের লোকদের সঙ্গে কিভাবে মিশে এক হয়ে গিয়ে তাদের শিক্ষা ও গ্রামোন্নতির ব্যবস্থা করতেন তার পরিচয় পাই কিছুদিন আগে ডঃ উমা দাশগুপ্তর কাছে কওয়া এই ননীবালা দেবীর স্মৃতি কথায় : "গ্রামের সঙ্গে মেলামেশা করাটাই আমাদের মূল পন্থা ছিল। এলমহার্ষ্ট সাহেব, মিস্ গ্রীণ, কালীমোহন বাবু সকলেরই এক সিদ্ধান্ত। কালীমোহন-বাবু সুন্দর মিশতে পারতেন গ্রামের মানুষের সঙ্গে। ওঁর থেকে সেটা শিখতাম। মিস্ গ্রীণের আমলে চারটি মহিলা সমিতি হয়। সেই মহিলা সমিতিগুলিকে কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে সেলাইয়ের ক্লাস নিতাম। সেলাই শেখাতে শেখাতে পোয়াতির কথা বলতাম। তা না হলে তো এসব কথা কেউ শুনতে আসত না।"

বাস্তবিকই গ্রামবাসীদের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন কালীমোহন। গ্রামোন্নয়নের কাজে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন বেশির ভাগই

পায়ে হেঁটে এবং কখনো গরুর গাড়ী চেপে। পল্লীবাসীদের প্রাজ্ঞ পিতার মতো প্রতি পদে পদে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এইভাবে গ্রামের কাজ করতে করতেই শরীর তাঁর ক্রমশই ভেঙ্গে পড়তে থাকে। প্রায়ই পাথরী রোগে ভুগতেন। শেষদিকে মাঝে মাঝেই শয্যাশায়ী হতেন রক্ত চাপের জন্য। তথাপি নিয়মিত স্নান খাওয়া দাওয়া তিনি করতে পারতেন না। এইরকম অনিয়মিত ভাবে জীবন চলার ফলে ১৯৩৯ সালে অত্যন্ত অসুস্থ হন তিনি। তখন কিছুটা বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। অবশ্য তাঁর মন মেতে থাকত গ্রামের সমস্যায় সর্বদা। তাই ঐ অবস্থাতেও স্বাস্থ্যের কথা না ভেবে তিনি গেছেন গ্রামে গ্রামে। এমনকি দেহের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় যখন ১৯৪০ সালের ১২ই মে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে তাঁর দেহাবসান হয়, তখন ঐ মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থায়ও তাঁর মুখে শোনা যায় গ্রামোন্নয়নের কথা।

গ্রামোন্নয়নের কাজে শরীর যে কালীমোহন ঘোষের কাছে কোন ব্যাপারই নয় সেকথা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করে গেছেন: "যখন একথা কাউকে বলে কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে একথা আমাকে বলতে হল—আচ্ছা, আমিই একাজে লাগব। এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটি মাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দুবেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিশের খাতায় নাম উঠেছে।"

এই কালীমোহন ঘোষেরই কিছুকাল আগে পূর্ণ হল জন্মশতবর্ষ। সেই সূত্রে স্মরণ করি তাঁর গ্রামোন্নয়ন কর্মে নিরলস নিষ্ঠা ও নিপুণতার কথা, যা ঐ রকম কাজে আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারে এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এছাড়া এ বছরেই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মবর্ষপূর্তি উৎসব। অতএব এই উপলক্ষ্যে আমরা গুরু ও শিষ্যকে একত্রে জানাই আমাদের প্রাণের প্রণতি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনাই সকলে সমবেতভাবে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত:

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান॥"

॥ নয় ॥

গ্রামবাংলার উন্নয়নে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

"আত্মঘাতী উদ্যমহীনতা আমাদিগকে স্বল্পায়াসে কৃতকার্যতা লাভ করতে চেষ্টিত করে। তাই আজ সব ক্ষেত্রেই চাই সাধনা। অন্নসমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, অর্থ-সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা প্রভৃতি নানা সমস্যায় পড়ে আমরা সবরকমে মাটিহয়ে যেতে বসেছি। এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে লেগে পড়ে থেকে এক একটি সমস্যার মীমাংসা করতে না পারলে আমাদের আব বাঁচবার আশা নেই।"

—**আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়**

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম বৈজ্ঞানিক হিসাবেই বিশেষভাবে পরিচিত হলেও তাঁর মন বিজ্ঞানাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি তাঁর ভাবনাকে ছুটিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরে, মাঠে-প্রান্তরে, ক্ষেতে-খামারে; বইয়ে দিয়েছিলেন বাংলার পুকুর, খাল-বিল, নদী-নালায়। কি করে বাংলার গ্রামের উন্নতি হয়, কিভাবে গরীব গ্রামবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হয় সেসব বিষয়ে তিনি তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার থেকে কোন অংশে কম মনোনিবেশ করেননি। এর জন্য তিনি ঘোরাঘুরি করেছেন যথেষ্ট, ঘেঁটেছেন বহু বইপত্র, লেখালেখিও মন্দ করেননি, দিয়েছেন প্রচুর বক্তৃতাও।

আমাদের দেশের বেশীরভাগ মানুষই পল্লীবাসী। তাদের অধিকাংশই আবার কৃষিজীবী। এদের সাহায্যেই আমাদের জাতীয় উন্নতির উপায় করতে হবে। একথা আচার্য রায় ভালভাবে উপলব্ধি করেই আমাদের সকলকে সচেতন করে দিয়েছেন: "আমাদের দেশে ধন সৃষ্টি করে একমাত্র কৃষক।" কিন্তু তাঁর দুঃখ যে, আমাদের দেশের তথাকথিত ভদ্র সম্প্রদায় এখনও কৃষিকর্মকে অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। সেইজন্য তাঁকে আবার দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করতে শোনা যায়: "কৃষিকাজই দেশের প্রকৃত কাজ—চাষাকে আর চাষার কাজ বলে ঘৃণা করলে চলবে না।" আমাদের স্কুল-কলেজের ছেলেরা নিজেদের হাতে কৃষিকাজ করতে চায় না। কিন্তু তিনি

বলেন যে, বিলেতে পল্লীগ্রামে যে সমস্ত উচ্চ ইংরেজী স্কুল আছে সেগুলির মধ্যে বহু স্কুলের ছাত্ররা স্বহস্তে চাষাবাদ করে, নিজেরাই বাজারে তরি-তরকরী নিয়ে বেচে আসে এবং তার হিসেব-পত্র রাখে, অনেক স্কুলে আবার কৃষি-শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

আমাদের স্কুল কলেজের ছাত্ররা ছুটির সময় দেশে গিয়ে তাস-পাশা খেলে, আড্ডা দেয়, নিদ্রায় এলিয়ে পড়ে। সেজন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলেছেন: "নিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ করে ছাত্রেরা দেশের নানাস্থানে দেখে শুনে সময়টা কাজে লাগাতে পারে।" এইভাবে ঘুরে ঘুরে দেশের কোথায় কিভাবে কত বিভিন্ন ধরণের জিনিস উৎপন্ন হয়, আর তা কত রকম-ভাবে কত লোকের হাত দিয়ে নানাস্থানে চলে যায়, এই সব খোঁজখবর রাখলে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন হয় এবং অন্নসংস্থানের অনেক নতুন পথ চোখের সামনে খুলে যায় বলে তিনি জানিয়েছেন। এ ব্যতীত এইসব ছাত্রেরা ঐ সময় আমাদের নিরক্ষর গ্রামবাসীদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের কাজ করতে পারে। তাঁর ভাষায়: "পল্লীই হচ্ছে আজ আমাদের বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র।"

ঘটনাচক্রে প্রফুল্লচন্দ্রকে শহরে থাকতে হলেও পল্লীগ্রামের সঙ্গে তাঁর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। এই সুযোগে বলে নেওয়া যাক্ যে, প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা শহরের ৪৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে সুবিখ্যাত কপোতক্ষ তীরে রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী দেশের মধ্যে পশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের জন্য সর্বপ্রথম নিজের বাসভবনে একটা আদর্শ মধ্য ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। হরিশচন্দ্র তাঁর প্রজাদের খুব ভালবাসতেন। প্রজারা তাঁর কাছে এসে নিজেদের দীনতার কথা জানালে তিনি তাদের খাজনা মুকুব করে দিতেন—; অথচ সরকারের রাজস্ব তাঁর ধার করে চালাতে হত। আর তাঁর মাতা ভুবনমোহিনীর মধুর প্রকৃতি এবং কোমল হৃদয় নিতান্ত পরকেও নিত আপন করে।

প্রফুল্লচন্দ্রের পরোপকার ব্রত গ্রহণের দীক্ষা তাঁর পিতামাতার কাছেই হয়েছিল। খুলনা জেলা ব্যাপী যখন প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন প্রফুল্ল

চন্দ্র দেশের লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে তিন লক্ষ টাকা জোগাড় করেছিলেন। আবার উত্তরবঙ্গে যখন একবার ভয়াবহ বন্যা হয় তখন বন্যা-পীড়িত নরনারীর দুঃখ-দুর্দশার কথা ভেবে "বেঙ্গল রিলিফ কমিটি" নামে একটা কমিটি গঠন করে বন্যার্তদের সাহায্যের সমস্ত দায়িত্ব ঐ কমিটির ওপর ন্যস্ত করে কাজে অগ্রসর হন। ভিক্ষালব্ধ প্রায় দশ লক্ষ টাকা তিনি তাঁর যুবগোষ্ঠীর সাহায্যে বন্যাপীড়িতদের দুঃখ দূরীকরণের জন্য ব্যয় করেছিলেন।

বাংলার পল্লীর সুখ-দুখের কাহিনী প্রফুল্লচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ছুটিছাটায় বা যখনই সুযোগ-সুবিধা হয়েছে তখনই বাংলার নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়ে কৃষি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং কে কোথায় চাষাবাদ করে ফসল ফলিয়ে গ্রামে থেকে নিজেদের আহার সংস্থানের চেষ্টা করছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন। তাঁরই ভাষায়ঃ "বাংলার যত্রতত্র ভ্রমণ করিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।"

বাংলার গ্রাম-জীবনের সঙ্গে যে আচার্য-রায় সম্পূর্ণ মিশে যেতে চাইতেন তা বোঝা যায় ছোট্ট একটা ঘটনার ভেতর দিয়ে। খুলনা জেলার এই ক্ষুদ্র গ্রামে একবার একটা শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তিনি গেছেন। সঙ্গে মেঘনাদ সাহা ও জ্ঞান ঘোষ। ঐ গ্রামের খাটা পায়খানা ব্যবহার করতে তাঁর অসুবিধা হবে বলে কমোডের ব্যবস্থা করায় প্রচণ্ড রেগে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে, চিরকাল হাবড়ে, অর্থাৎ জলকাদা মেশানো মাঠে মল ত্যাগ করে এসেছেন এখন কমোডের কোন দরকার নেই। অগত্যা তাঁকে ঐরকমের মাঠে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি যতদিন ওখানে ছিলেন ততদিন ঐরকমই করতেন। আবার তাঁর দৈনন্দিন কাজ ছিল খুব ভোরে উঠে সম্পূর্ণ একাকী ঐ গ্রামের নির্জন রাস্তায় কিছুদূর হেঁটে আসা। স্নানও তিনি ঘরে কখনই করতেন না। অন্যান্য সবাই যেমন পুকুরে নেমে সাঁতার কাটত উনিও তেমনিভাবে সাঁতার কাটতেন। এইভাবে যতদিন তিনি ঐ গ্রামে ছিলেন ততদিন যেন তিনি ঐ গ্রামেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রিয়তম ছাত্রদের নিষেধ সত্ত্বেও রুগ্ন শরীর নিয়ে ফরিদপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন নি। সেখানকার কৃষিক্ষেত্রের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা এবং চাষীদের সঙ্গে অবাধে ও সমানভাবে মেলামেশা করে তাদের মধ্যে উন্নত প্রণালীর চাষাবাদের প্রচলনের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করা তাকে খুব আনন্দ ও উৎসাহ দিয়েছে। তাই তিনি শিক্ষার্থী হিসেবে ওখানে যেতেন। ঐ জেলায় কি কি ফসল কত জমিতে গড়ে কতটা করে হয় এবং তার মূল্য হিসেবে কৃষকরা কত টাকা পায় এইসব তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করেছেন তিনি।

আমাদের দেশের চাষীদের জমিগুলি খণ্ড খণ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং তারা নিরক্ষর। তাই কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, দরকার: "১ম শিক্ষা, ২য় শিক্ষা, ৩য় শিক্ষা।" তাঁর কথা হল যে, কৃষিজীবিদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তিনি মনে করেন, অর্থের তেমন অভাব নেই, অভাব শুধু চেষ্টার। তাই তিনি গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলতে এবং ক্রিয়াকর্মে কম ব্যয় করতে উপদেশ দেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন: "প্রজাশক্তি যদি জাগিয়ে তুলতে হয় তবে এখন শিক্ষার দীপ গ্রামে গ্রামে জ্বেলে দিতে হবে।"

আচার্য রায় মনে করেন, যে সমস্ত জায়গায় যে সব চাষবাস উন্নত প্রণালীতে হচ্ছে সে সকল জায়গা থেকে তা শিখে এসে কয়েকটা গ্রাম নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্র করে কিছুটা সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সেইভাবে ফসল উৎপাদন করে আমাদের চাষীভাইদের দেখাতে পারলেই দেশের কৃষিকাজের প্রকৃত উন্নতি হবে। এসব ঠিকমত করতে হলে গ্রামে গিয়ে থাকতে হবে এবং কৃষকদের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে হবে। তাই তিনি সতর্ক করে দেন: "কৃষকদের উন্নতি করতে হলে কৃষকদের পোষাক পরতে হবে— তাদের সঙ্গে বাস করতে হবে—গ্রামের মধ্যে দুচার বিঘা জমি নিয়ে উন্নত শ্রেণীর ফসলের চাষাবাদ করে তার সুফল কৃষকদের দেখাতে হবে।"

মোদ্দা কথা, কৃষির উন্নতি চাই। কৃষির প্রসারেই উদরান্নের সংস্থান

হবে বলে প্রফুল্লচন্দ্র মনে করেন। তিনি যথার্থই ধারণা করেছিলেন যে, উন্নত কৃষি প্রণালী অবলম্বন করে বছরে একই জমিতে আমাদের নিজেদের ও গরুর খাদ্য আনায়াসে জন্মাতে পারা যায়। তিনি আরও বলেন যে, উন্নত শ্রেণীর শস্যাদি জন্মিয়ে দেশের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে। তাই আমাদের দেশের আরাম প্রিয় বিলাসে নিমজ্জিত বুদ্ধিমানেরা যখন দেশের জন্য আর কি করার আছে জিজ্ঞাসা করেন তখন প্রফুল্লচন্দ্রের উক্তি: "গ্রামে যাও, চাষবাস করিয়া খাও।" অথচ সমস্যা দেখা দেয় জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমেই হ্রাস পাওয়ায়। তাই তিনি মনে করেন যে, জমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি প্রভৃতির উপায় আবিষ্কার করাতেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। অতএব, তাঁর কথা: "সারের প্রচলন করতেই হবে।" তাঁর মতে গোবর সারই আমাদের প্রধান সার। কিন্তু আমাদের রাখার ও ব্যবহারের পদ্ধতিতে নাকি তা "অসার" হয়ে যায় বলে তাঁর ধারণা। সেই কারণে তিনি পরামর্শ দেন: "একটা গর্ত করে গর্তের ওপরে একটা ছাউনী দিয়ে যদি গোবরটা রাখা যায় তাহলে আমরা সারের ফল পাই।"

প্রফুল্লচন্দ্র আরও বলেন গরুর চোনায় যথেষ্ট পরিমাণ যে এমোনিয়া ঘটিত পদার্থ থাকে তা জমির খুব ভাল সার রূপে ব্যবহার করা যায়। পাঠ্যাবস্থায় তিনি নাকি এডিনবরায় দেখেছেন যে, স্কচ গোয়ালা চোনা, গোবর, খড় ও চুণ একসঙ্গে মিলিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখত এবং কয়েকমাস পরে সার হিসেবে ব্যবহার করত। তাঁর দুঃখ, আমাদের দেশের চাষীরা এসব কথা জেনেও সার প্রয়োগের দিকে তেমন মন দেয় না। এক্ষেত্রে তিনি চীনের প্রশংসা করেন। সেখানে জীবের মল-মূত্রাদি যাবতীয় অপবিত্র জিনিসই সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ওখানে তাঁর ভাষায়: "গোবর, অশ্ববর এবং প্রধানতঃ নরবর সার রূপে জমিতে প্রয়োগ করা হয়।"

চীন ও জাপানে নাকি বিষ্ঠার সার হিসেবে খুব বেশী কদর। গোবরের চেয়ে মানুষের বিষ্ঠা আরও মূল্যবান। জাপানে বিষ্ঠা বাড়ী থেকে যেচে যেচে কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে ওটাকে আমরা শুধু ঘৃণা করতেই জানি, কাজে লাগাবার কোন ব্যবস্থাই দেখি না। কেবলমাত্র দুটো

একটা ছাত্রাবাসের পায়খানার মল প্রথমে একটা পুকুরে ফেলে তার ওপর একরকম জীবাণুর চাষ করা হয়, যার ক্রিয়াতে মলের বদ্‌গন্ধ দূর হয়। পরে সেই গন্ধহীন মলকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে খানিকক্ষণ থিতিয়ে ঐ মলযুক্ত জল বাঙ্গালোরের মরুভূমিসম মাটিতে মাঝে মাঝে সেচন করে সোনা ফলানো হয়। এসব কথা উল্লেখ করে আচার্য রায় বলেন যে, আমাদের এই বঙ্গভূমিতেও ঐভাবে মলমূত্রাদিকে সারে পরিণত করে মাটির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো যায়। এভিন্ন ধনচে সবুজসার প্রচলনেও জমির উর্বরতা যথেষ্ট বাড়ে বলে তিনি জানান। আবার অনেক জমিতে "ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড" বা ময়লা পুঁতে রাখার কথাও তাঁকে উল্লেখ করতে দেখি। সেইসব সারবান জমিতে নাকি "বার মাসে তের ফসল" জন্মায়।

সার এবং জলসেচন দ্বারাই জমির উর্ব্বরাশক্তিকে অটুট রাখা যায় বলে আচার্য রায়ের ধারণা। তাই তিনি পুরাতন মজা বোজা পুকুর, বাঁধ, দীঘি আবার ঝালিয়ে কাটিয়ে সজল করে তোলার কথা বলেন। তাঁর মতে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রেখে সেই জল যেদিকে খুশী নিয়ে গিয়ে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু এইসব বাঁধ বাঁধার জন্য চাই সমবেত প্রচেষ্টা। তাঁর ভাষাতে: "দুই পাঁচটা গ্রামের লোক মিলে সেই গ্রামের জল সরবরাহের জন্য বাঁধ তৈরী করতে হবে। সকলের স্বার্থ সেই বাঁধে থাকবে। এই সমস্ত কাজের জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক চাই।" এই প্রসঙ্গে তিনি খুলনায় তাঁদের বাড়ীতে একটা ব্যাঙ্ক হওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন যাতে এরকম ব্যাঙ্ক দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তার চেষ্টা করা দরকার। আসল কথা তাঁর বক্তব্য সময়মত চাষ, জমির তদ্বির, জলসেচন ও উপযুক্ত সার প্রয়োগেই কৃষির উন্নতি হতে পারে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নানারকম নতুন ফসলের প্রচলন করার কথা বলেন। আলু একটা লাভবান ফসল। যত্ন করে সেচ দিয়ে আলুর চাষ করলে এক বিঘা জমি থেকে ১০০ মন পর্যন্ত আলু পাওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। তাঁর ধারণা, চীনাবাদামের চাষ ডাঙ্গা জমিতে ভাল হয়। এছাড়া খেজুর গাছ লাগিয়ে গুড় তৈরী করে, কুল পলাশ গাছে গালার চাষ করে যে

অবস্থার প্রভূত উন্নতি করা যায় তার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। তিনি যখন ফরিদপুর গিয়েছিলেন তখন কৃষি বিভাগের দেবেন্দ্রবাবু তাঁকে টানা আক নামে একরকম আক দেখিয়েছিলেন, যে আকের ফলন বেশী এবং শেয়াল-শূয়োরে খায় না। চিনির যা বাজার তাতে আকের চাষ বাড়াতেই হবে এবং টানা আকের চাষে দেশে প্রচুর অর্থাগম করে। ফরিদপুরের কৃষিক্ষেত্র দেখে তিনি খুশী হয়েছেন। ওখানে গম পর্যন্ত জন্মেছে। তরিতরকারী তো হয়ই।

ফরিদপুরে একবার সারাদিন অনাহারে কাটিয়েও প্রফুল্লচন্দ্র স্থানীয় গুরু ট্রেনিং স্কুল দেখতে যান। ঢুকেই ২৫/৩০ জন ভদ্র সন্তানকে মাঠে কোদাল, খুরপী প্রভৃতি নিয়ে সব্জাবাগানে কাজ করতে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। কৃষিবিভাগ থেকে ১০০ টাকার যন্ত্রপাতি গুরুদের কাজের জন্য এই স্কুলে দেওয়া হয়েছে। এই গুরুরা এখান থেকে উন্নত শ্রেণীর চাষাবাদ নিজেরা হাতে কলমে শিখে গিয়ে গ্রামের মধ্যে ঐ সব শিক্ষা প্রচলন করবেন। তিনি শুনে সুখী হয়েছেন যে, যেসব গুরুরা ওখান থেকে শিক্ষা নিয়ে গ্রামে গিয়ে শিক্ষকতা করছেন তাঁরা কটকতারা ধান, কাইম্বাটুর আখ প্রভৃতির বীজ চেয়ে পাঠাচ্ছেন।

আরো আশান্বিত হয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এইসব দেখে যে, সখীচরণ নামে এক ভদ্রলোক নিজে ও তাঁর ভাইপো প্রায় এক বিঘা জমিতে আখ জন্মিয়ে তা মাড়াই করে গুড় করছে এবং কিছু জমিতে আলু, কপি ও অন্যান্য শাকসব্জী করা হচ্ছে। আবার পুলিশ সাহেব মিঃ হক্‌কে স্বয়ং বাগানে দাঁড়িয়ে একদিকে ফুলের গাছ অন্যদিকে নানারকম তরিতরকারীর তদারকি করতে দেখেন। তারপর তাঁর এক ছাত্র সাবডিভিশনাল অফিসারের বাড়ীতে ১½ কাঠা জমির মধ্যে এত রকম ফসল করা হয়েছে যে, তার সমস্ত পরিবারের জন্য বাজার থেকে তরকারী কিনতে হয় না। দেখে একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তিনি ব্যক্ত করেন : "আমি স্বচক্ষে দেখলাম তারা নিজেরা লাঙ্গল চষছে, কোদাল মারছে, গোবর নিকুচ্ছে। এদের দেখে বড়ই আনন্দ পেলুম।"

আজকাল তরিতরকারীর যা ভীষণ দাম তাতে আচার্য পি. সি. রায় এই সব ফসল কোলকাতার আশেপাশে উৎপন্ন করার যে বুদ্ধি দেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে তিনি লণ্ডনের চারধারে যে এইরকম "কিচেন গার্ডেনিং" দেখেছেন সেকথা উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, যে সমস্ত দূরদর্শী কৃষক মরসুমের একটু আগে বৃষ্টির অভাবে পুকুর কেটে বা অন্য উপায়ে জলসেচ করে এই রকম ফসল ফলাতে পারে তারা উচ্চহারে শাকসব্জী, তরিতরকারী বিক্রী করে লাভবান হতে পারে। একটু পরিশ্রম করলেই যে আমরা আমাদের নিজের নিজের তরিতরকারী অনায়াসে উৎপন্ন করতে পারি, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। এ সম্বন্ধে তিনি আবার চীনাদের কথা বলেন যে, চীনের ওপর তিনি প্রচুর বই পড়ে জেনেছেন যে, তাদের অভিধানে "আলস্য" বলে কোন কথাই নেই।

আবার দৌলতপুর থেকে দুমাইল দূরে গাঁইকুড় গ্রামের মেনাজ শেখ কি-ভাবে ক'টা পুকুর কেটে তার জোরাল মাটির পাড়ের ওপর আনারস গাছ লাগিয়ে প্রতিবছর সহস্রাধিক টাকা লাভ করে এবং বেগুন কুমড়ো, ঝিঙে প্রভৃতি অন্যান্য তরকারী উৎপন্ন করে বারমাস ব্যবসা চালায় তার হিসাব দেখিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র খুব ইঙ্গিতপূর্ণ একটি মন্তব্য করেন: "...আর আমরা ভদ্রলোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে গোলামি করিতে যাই।" আমাদের গৃহসংলগ্ন জমিতে ফুলের চাষ করতেও তিনি উপদেশ দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ফ্রান্সের নজির দেখান। বাংলাদেশকে তো কবিরা বলে থাকেন সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, ফ্রান্সও নাকি অনেকটা ঐরকম। ফ্রান্সও কৃষিপ্রধান দেশ। সেখানে একটুকরো জমিও খালি পড়ে নেই। ফুলের প্রতি তাদের অপরিসীম ভালবাসা।

পুকুর কেটে যে শুধু জলসেচ হবে তা নয়, মাছ চাষের কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, যদি এক এক জন যুবক দশ-পনের বিঘা জমি মৌরশী করে নেয় এবং মাঝে একটা পুকুর কেটে তার মাটি চারিধারে ছড়িয়ে দিয়ে কলা, কচু, বেগুন, কুমড়ো, লাউ, সিম প্রভৃতি উৎপন্ন করে, আর পুকুরে মাছ জন্মায়, তবে সামান্য কেরাণীগিরির থেকে অনেক সুখে স্বাচ্ছন্দে-থাকা যায়। "অন্ন

সমস্যা” প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেন ঃ “পুকুরে পোনা মাছ ছাড়তে হয়—নোনা জলে নদীর নোনা মাছ জন্মাবার চেষ্টা করতে হয়। ঐসব মাছ বড় হলে অর্থাগমের বেশ একটা উপায় হয়।” আমাদের দেশের জেলেরা অজ্ঞ, মূর্খ। তারা জাল ফেলে চুনা পুঁটি ও বড় মাছ সবই তুলে ফেলে। তাই এক্ষেত্রে তিনি ইংলণ্ডের উদাহরণ দেন যে, সেখানকার নদীতে নাকি বাচ্চা মাছ ধরা নিষেধ। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মাছের চাষের জন্য যে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন সেকথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

কৃষিকাজ এবং পশুপালন হাতাহাতি একই সঙ্গেই চালাবার জন্য পরামর্শ দেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। বিলেতে নাকি তিনি তাই দেখেছেন। হালের বলদ ও দুধের জন্য চাই গরু। বাংলায় দুধের অভাব। সুপ্রজনন অভাবে, খাদ্যের অভাবে আমাদের গরুগুলির জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি মর্মাহত। গ্রামের গোচারণ ভূমি ক্রমশঃ লোপ পাওয়ায় এবং গোসেবাকে গৃহস্থের নিত্যকর্ম বলে মনে করার প্রথা অবলুপ্ত হওয়ায় তিনি ব্যথিত ও চিন্তিত। তাই করুণায় বিগলিত হয়ে তিনি মনে করেন, কিসে গোজাতির উন্নতি হয়, কিভাবে দুধ ও দুধজাত দ্রব্য যথানিয়মে সংগৃহীত ও প্রস্তুত হয় সে সমস্ত বিষয়ে সাধারণের অজ্ঞতা দূর করাই আদর্শ গোশালার পরীক্ষাগারের কাজ হওয়া উচিত। বিলেতে একটা গোশালা দেখে তিনি মন্তব্য করেন ঃ “যদি কেহ গরুর যত্ন ও সেবা করে তাহা হইলে সে জাতি ইংরাজ।...আমরা মুখে বলি, আমাদের গোমাতারপ্রতি ভক্তি অসাধারণ. কিন্তু গোজাতিকে আমরা যেরূপ তাচ্ছিল্য করি, বিলাতের গোখাদক জাতিও সেরূপ করে না।”

আচার্য রায়ের কাছে শোনা গেছে যে, ইংলণ্ডের দুধ কত মিষ্টি ও কি ঘন। কৃষিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব সকলেরই নাকি নজর থাকে যাতে পীড়িত গাভীর দুধ বিক্রী না হয়। গরুর সংক্রামক রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে ; তৎক্ষণাৎ তার প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা হয়। তার ওপর ঘাস চাষের সুবন্দোবস্তও নাকি সেখানে আছে। বছরে দু-তিন বার ফসল কাটা হয়। গ্রীষ্মকালে যখন প্রচুর ঘাস জন্মায় তখন সেগুলি শুকিয়ে রাখা হয়

যাতে শীতকালে টান না পড়ে। এছাড়া গরুর জন্য প্রকাণ্ড মূলো জাতীয় Mangel wurzel", গাজর, শালগম, বীট প্রভৃতি ফসলের রীতিমত চাষ করা হয়। বিলেতে ম্যাঞ্চেষ্টারের পাইকারী সমবায় ভাণ্ডারের নিজস্ব গোচারণের সুবিস্তীর্ণ মাঠে শত সহস্র গাভী দেখে এবং সেই সব গাভীর দুধে নিজেদের জন্য জমাট দুধ তৈরী হয় শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

গ্রামীণ অর্থনীতির ভয়াবহ বেকার সমস্যার কবল থেকে মুক্তি লাভ করার একটা ভাল পথ হিসেবে আচার্য রায় আমাদের পোল্‌ট্রি ফার্ম করার উপদেশ দিয়েছেন। "অন্নসমস্যা" নামক প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন : "আমি তোমাদের মুরগী ও শূওরের চাষ করতে বলি,—যাকে বলে Poultry Farm। নিজে দাঁড়িয়ে লোকের দ্বারা কাজ করাবে। একাজেও অর্থোপার্জন বেশ হয়।" এছাড়া গ্রামে গ্রামে ধান ভাঙ্গা ও চরকার দ্বারা যে উদরান্নের সংস্থান করা যায় সেকথা তো তিনি বহু জায়গায় বহুবার বলেছেন। অবসর সময়ে চরকা কাটার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দানই খাদি প্রচারের জন্য। তিনি নিজে যে খদ্দর পরতেন সে তো সকলেরই জানা। চরকা সম্বন্ধে তিনি ছোট্ট একটা পুস্তিকাও লিখেছেন। তাঁর ধারণা, চরকায় সুতো কাটার বৃত্তিতে অন্ততঃ "পেটভাতায়" থাকা যায়।

এইভাবে কুটির শিল্পের পুনঃস্থাপনায় শ্রমিক ও মালিকের একত্র জীবিকা অন্বেষণে সখ্য ও প্রীতি স্থাপিত হতে পারে। অর্থাৎ এতে শুধু বস্ত্র সমস্যার সমাধানই নয়, গ্রামের সূত্রধর, কর্মকার, তাঁতী প্রভৃতির কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে উদারান্নের সংস্থান হয় এবং পরস্পর এক কর্মশৃংখলে গ্রথিত হয়ে গ্রামকে সমৃদ্ধশালী করা যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা : "দৈনিক পাঁচ-ছয় ঘণ্টা চরকা চালালে অন্নবস্ত্র দুয়েরই সংস্থান হয়।"

চরকায় সুতো তৈরী হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁত বসে, আর সেই সঙ্গে কার্পাসের চাষও শুরু হয়। নিজেরা নিজেদের তুলো উৎপন্ন করে নিতে পারলে খরচও কিছুটা কম হয়। একবার বাঁকুড়া শিল্প প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটনে আচার্য রায়ের ভাষণ : "সকলেই দৃঢ় পণ করুন যাতে তুলার চাষ বাড়ে

ও চরকা প্রচলন হয়। এখানে এমন কে আছেন যাঁর বাড়ীতে দশ পনেরটা কার্পাস গাছ লাগাবার জমি নেই? ...আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা করুক কেমন করে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তুলা তুলে চরকা চালিয়ে তাঁত বুনে নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে ধনী হতে হয় ও দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য রাক্ষসকে বধ করতে হয়।"

জমিদারদের সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্রের ধারণা যে, তাঁরা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে প্রবাসে থাকলে তারাই দেশের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তিনি মনে করতেন, জমিদাররা যতই অনাচারী হোক না কেন তবুও যদি তাঁরা গ্রামে থাকে তাহলে এই অত্যাচার লব্ধ অর্থ গ্রামেই ফেরৎ আসে। কিন্তু কোলকাতায় থেকে নায়েব গোমস্তার মাধ্যমে জমিদারী চালানোয় এরাও ঠকে, প্রজারাও মরে। জমিদার বাবুরা প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা টেরও পায় না। প্রজাদের মঙ্গলের জন্যও কিছু করে না। "এই সমস্ত প্রবাসী জমিদারদের" তাঁর ভাষায়ঃ "ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।" তাদের বিনাশ সম্বন্ধেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চকণ্ঠে অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: "জমিদারেরা প্রজার কষ্টার্জ্জিত অর্থ শোষণ করে কলকাতায় বসে বিলাস ঐশ্বর্যে ডুবে পরের ধনে পোদ্দারী করবেন—এ আর চলবে না।"

কিছু জমিদার অবশ্য তাদের জমিদারীর মধ্যে উন্নত ষাঁড় রেখে স্থানীয় গোজাতির উন্নতির চেষ্টা করেছেন ও উন্নত কৃষি প্রণালীর প্রবর্তনের জন্য পরামর্শাদি করেছেন জেনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। আবার আমাদের বাংলার মাটিতে যেসব ফসল হয় তার প্রায় সমস্তই যে কিভাবে মধ্যবর্তী ব্যাপারীরা চালান দেয় তার ভয়াবহ রূপও তিনি নানস্থানে ফুটিয়ে তুলেছেন। জমিদাররা যে কর পায়, সেই জমিদারীতেই মহাজন, দালাল বা ফোড়েরা দাদন দিয়ে জমিদারের অন্যূন দশগুণ আদায় করেও যে কিভাবে প্রজাদের শোষণ করে তার ইঙ্গিতও পাওয়া যায় টাঙ্গাইল জনসাধারণের কাছে এক বক্তৃতায় তাঁর দু-একটি প্রশ্নেই: "মফঃস্বলে দাদন দিয়া উৎপন্ন শস্যাদি কাহারা নাম মাত্র মূল্যে চালান দিতেছেন? তারপর আমাদেরই ক্ষেতজাত পাট যখন পাটকলে যায়, তখনই বা কি দাম দেওয়া

হয়, আর যখন কল হইতে বাহির হয় তখনই বা ইহার দাম কত হয়?" এইভাবে বাঙ্গালী প্রজাদের বার বার তিনি সাবধান করে দিয়েছেন।

গ্রামবাংলার মানুষের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের প্রচণ্ড মাথা-ব্যথা ছিল। "বাঙ্গালী মরণের পথে" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন: "গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং আমার দৃষ্টি কেবল এক দিকেই রহিয়াছে— বাঙ্গালীর শারীরিক শোচনীয় অবস্থা, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।" দুধ, মাছ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব তাঁকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল। ঐসবের অভাবে যে বাঙ্গালী কেবল আজে বাজে জিনিষ খেয়ে পেট ভরায়, তাতে তিনি খুব দুঃখের সঙ্গে ঐ প্রবন্ধেই আরও বলেছেন: "দরিদ্র চাষা ভূষার ছেলে পিলে অনেক সময় ভাতের মাড় এবং ভদ্রঘরের সন্তানগণ বার্লি প্রভৃতির 'লেই' দিয়া কোন রকমে উদর ভর্তি করে। এইগুলি শ্বেতসার (Starch) প্রধান উপাদান। ইহাতে ক্যালসিয়াম নাইট্রোজেন প্রভৃতি উপকরণ, যাহা অস্থি ও মাংসপেশী গঠনের প্রধান সহায়, তাহা আদৌ নাই। বাঙ্গালী ছেলেদের বুকের (chest) পরিধি দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে এবং চেহারাও জীর্ণ শীর্ণ।" অন্যত্রও তিনি শোকাহত হয়ে বলেছেন: "বাংলাদেশেরই বুদ্ধি ও বল পক্ষাঘাতে মারা গেছে।"

এরপরই আসে নানাবিধ রোগ ব্যাধির কথা। আমরা আবার যেরকম পরিবেশে বাস করি তাতে অতিদ্রুত রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। জলাশয়গুলি শুকিয়ে এলে লোকের "কাদার গোলা" পান করার অবস্থা হয়। সেই জল আবার গরু মোষ পঙ্কিল করে। অশিক্ষিত মানুষ স্নানের সময় মল-মূত্রাদি ত্যাগ করে। বিশেষতঃ নানারকম সংক্রামক ব্যাধি যুক্ত কাঁথা কাপড় কেচে অবস্থা আরো ঘোলা করে। ছড়িয়ে পড়ে কলেরা, আমাশা প্রভৃতি রোগ। প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায়: "রুদ্ধ বায়ু, রুদ্ধ জল রোগ শোক মৃত্যুর নিদান।" তাই তিনি উপদেশ দেন: "একটু বাতাস—আলোর পথ রাখতে হবে।……পুকুর গুলোকে মলমূত্র থেকে নিরাপদ করতে হবে।"

যিনি শিক্ষা, রাস্তাঘাট, সর্ববিষয়ে উন্নতি করার অঙ্গীকার করবেন তাঁকেই ভোট দেবার যথার্থ বুদ্ধি দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অনেক আগেই

জনগণকে সচেতেন করে দিয়েছেন। আর সবচাইতে বড় কথা হল যে, এ ব্যাপারে তিনি যুবসম্প্রদায়কে আহ্বান করেছেন একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাধর্মে দীক্ষিত হয়ে সামাজিক উন্নতি করতে এগিয়ে আসতে। সেটাই হবে প্রকৃত দেশসেবা। তার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু হতে পারে না। অতএব, গ্রামে গ্রামে সমবায় কৃষি ও হিতসাধন সমিতি করে দেশোন্নতি করার পথ বাৎলে দিয়েছেন তিনি। তাঁরই ভাষায়ঃ "এইরকম সমিতি করেই দেশের পরম মঙ্গল সাধন করা যাবে—চাই একাগ্রতা কর্তব্য নিষ্ঠা আর স্বদেশ প্রেমিকতা। হিংসা—দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন—এই আমার বিনীত অনুরোধ।"

আচার্য রায় আজ আর এ জগতে নেই। ১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছেন। খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু কী করা যায়। সেই জন্যইতো মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রশ্ন:

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন—নদে?"

তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতো মনীষী মানব সমাজে যে এক অদ্ভুত আদর্শ দেখিয়ে গেছেন তার জন্য তিনি আমাদের অন্তরে অবশ্যই অমর। আবার অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, এই বছরটিই হল তাঁর ১২৫ তম জন্মবর্ষ-পূর্তি বৎসর। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল হতে উৎসারিত অপরিসীম ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে নিবেদন করি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রণাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করি একটি রবীন্দ্র-কবিতা:

"নিত্য তোমার চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি।"

গ্রামোন্নয়নে স্বামীজী

"...আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে...ইচ্ছা হয়...তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্ন-বস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হল? হায়! এরা দুনিয়া-দারির কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে—সকলে মিলে এদের চোখ খুলে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ একজন নিছক নির্জন গুহাবাসী সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত সাধু। তিনি একজন মায়াবাদী গৈরিকধারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও নিজের দেশ ও সমাজের সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেননি, তিনি দেশকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলেন। তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন: "সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল--মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

অতএব এই অবহেলিত, দরিদ্র, মূর্খ ভাইদের কল্যাণ সাধনের জন্য স্বামীজীর প্রাণ কেঁদেছে। তিনি লিপ্ত হয়েছেন নানান চিন্তা-ভাবনায়। তাঁর চিন্তার মূল কথাই হচ্ছে দেশকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। তিনি আত্মমুক্তি বা রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সঙ্গে সংযুক্তদের মুক্তির কথা বলেননি, বলেছেন দেশবাসীর মুক্তির কথা, আর্থিক ও সামাজিক মুক্তির কথা। তিনি মনে করতেন, দরিদ্র, মূর্খ, চণ্ডাল সকলের মধ্যেই রয়েছেন নারায়ণ তাই 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' করাই তাঁর প্রধান পরামর্শ:

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত পর্যটন করে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে, ভারতের জাতীয় জীবন গ্রামে গরীবদের ঘরেই লুকিয়ে রয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন যে, ভারতীয় অর্থনীতি প্রধানতঃ গ্রামীণ অর্থনীতি। আর গ্রামীণ অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিনির্ভর। তাই ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যদিও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ পছন্দ করতেন না, তবুও কৃষি উন্নয়নের খাতিরে উপদেশ দিয়েছেন: "পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর।"

আমাদের অবহেলিত শোষিত ও বঞ্চিত কৃষককুল যাতে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে দ্রুত উন্নতির পথে এগোতে পারে, সেজন্য স্বামীজী তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে বলেছেন। তাঁর মতে গ্রামবাসীদের গেঁয়ো চাষাভূষো বলে হেয় জ্ঞান না করে তাদের "ভাই" বলে কাছে টেনে নিয়ে জ্ঞানালোক জ্বালিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা আরো ভালভাবে আত্মনির্ভরশীলতার সঙ্গে বুক ফুলিয়ে কাজ করতে উৎসাহিত হয়। এই আত্মনির্ভরশীলতাই আসল কথা। তাইতো স্বামীজী বলেছেন: "জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।"

কৃষিকাজকে অবজ্ঞা করার যে একটা প্রবণতা আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত মানবসমাজে দেখা যায়, তার বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ রুখে দাঁড়ান। আমাদের প্রাচীনকালের রাজর্ষি জনক থেকে শুরু করে আধুনিককালের আমেরিকার উদাহরণ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করে কৃষিকর্মকে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন: "যা হোক, আমি তো ভেবে চিন্তে চাষবাস করাটাই ভাল মনে করছি।... শাস্ত্র পড়ে দেখ, জনক ঋষি এক হাতে লাঙ্গল দিচ্ছেন, আর এক হাতে বেদ অধ্যয়ন করছেন।...আবার আজকাল দেখ, আমেরিকা চাষবাস করেই এত বড় হয়েছে।" অতএব তাঁর মতে চাষাবাদের কাজ হেয় তো নয়ই, বরং জ্ঞানালোক জ্বালিয়ে তাকে আরো

ভালভাবে মাথা উঁচু করে করা উচিত। তাই তিনি উৎসাহিত করছেন: "জ্ঞানোন্মেষ হলেও...চাষা চাষই করবে। জাত ব্যবসা ছাড়বে কেন? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম যাতে আরো ভাল করে করতে পারে, সেই চেষ্টা করবে।"

স্বামীজীর মতে ছোট জাতের মধ্যে জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি দানের ভেতর দিয়ে ছোট জাত এবং বড় জাতের মধ্যে একটা ভাই ভাই ভাবে মেলামেশা হয় এবং এটার প্রয়োজন আজকের দিনে আমাদের কাছে খুব বেশী। তাই তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য: "যদি তোমাদের মতো লোকেরা কিছু লেখাপড়া শিখে পল্লীগ্রামে থেকে চাষবাস করে, আর চাষাদের সঙ্গে আপনার মতো ব্যবহার করে, ঘৃণা না করে, তাহলে দেখবে, তারা এতই বশীভূত হয়ে পড়বে যে, তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে। যেটা আমাদের এখন আবশ্যক—জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, ..পরস্পর সহানুভূতি, ভালবাসা, উপকার করতে শেখানো—তাও অতি অল্প আয়াসেই আয়ত্ত হবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন যে, শিক্ষার অভাবই—সে সাধারণ শিক্ষাই হোক বা কারিগরী শিক্ষাই হোক—দারিদ্র্যের প্রধান কারণ এবং সমাজের মূল ক্ষত। সাধারণ মানুষ শিক্ষিত হলে কেউ তাদের অবহেলা বা অত্যাচার করতে পারবেনা। সেইজন্যই তো তিনি শিক্ষা প্রসারের ওপর বেশ জোর দিয়ে বলেছেন: "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদের উন্নতি করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা।...যাহারা কুটিরে বাস করে...তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।"

আর সেটা কেমন করে করতে হবে তাও স্বামীজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর ভাষায় বুঝিয়ে আশ্বাস দিলেন: "জ্ঞান পিপাসা সকল মানুষের ভেতরই রয়েছে। তাই না তারা একজন ভদ্রলোক পেলে তাঁকে ঘিরে বসে, আর তাঁর কথা গিলতে থাকে। তাঁরা সেই সুযোগে যদি নিজের বাড়ীতে ঐরকম তাদের সব জড়ো করে সন্ধ্যার সময় গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, তাহলে রাজনৈতিক আন্দোলন করে হাজার বৎসরে যা না করতে পারা যাবে, তার শতগুণ বেশী ফল দশ বৎসরে হয়ে পড়বে।"

এইভাবেই আমরা দেখি যে, সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা মোচনের প্রতিবিধান হিসাবে স্বামীজী পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষা বিস্তারের। তিনি এইভাবেই নবভারতের স্বপ্ন দেখতেন : "নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে. ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে. হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে।"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই স্বপ্ন সার্থক করার জন্য আহ্বান করেছেন যুবশক্তিকে। যুবকদের গ্রামে গ্রামে গরীব চাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে বলেছেন এবং তাদের শিক্ষিত করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে অনুরোধ করেছেন ও প্রেরণা দিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়েছেন : "সঙ্ঘ চাই—কুড়েমি দূর করে দাও ; ছড়াও—আগুনের মতো, যাও সব জায়গায়।" এই যুব সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করে সঙ্ঘবদ্ধ করতে তিনি জীবন পর্যন্ত পণ করেছিলেন। তাইতো তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন : "আমি এই যুবক দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, ইহা আমি সাধন করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব।" আমরা জানি ১৯০১ সালে ঢাকা শহরে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীদের তিনি একটা কর্মীদল গঠন করতে পরামর্শ দিয়ে বলেন : "আমি তোমাদের সকলকে সমাজসেবার নির্দেশ দিতেছি।"

এই প্রসঙ্গে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর বছর ছয়েক আগে, যে সাক্ষৎকার নিয়েছিলেন, সেটির অংশবিশেষ উল্লেখ না করে থাকা যাচ্ছে না : "যদিও স্বামীজীকে তাঁর ঢাকায় আসার প্রথম দিনেই আমি দর্শন করেছিলাম তবু আমি মনে করি, তাঁকে সত্যিকারের 'প্রথম' এবং 'প্রকৃত' দর্শন আমি করেছিলাম স্বামীজীর ঢাকা থেকে চলে যাবার দু-একদিন আগে। যে কারণে ঐ দিনটিকে আমার স্বামীজীকে 'প্রথম' এবং 'প্রকৃত' দর্শনের দিন বলছি তা হল এই : ঐ দিনই স্বামীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এবং একান্তে দেখা করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

ঐদিন এবং তার পরের দিন স্বামীজীর সঙ্গে আমার ঐ সাক্ষাতের ফলে আমি জীবনে এক নতুন আলোকের সন্ধান পেয়েছিলাম, যা আমার জীবনের গতিপথকে নির্ধারিত করে দিয়েছিল। অবশ্য ঐ দুর্লভ দর্শনের এবং তাঁর আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা লাভের সৌভাগ্য শুধু আমার একাই হয়নি। আমার সঙ্গে ঐ দুদিনই ছিল আমার 'বাছাইকরা' কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যেমন শ্রীশচন্দ্র পাল, আলিমুদ্দিন আমেদ প্রভৃতি। সবসুদ্ধ আমরা ছিলাম দশ-বারোজন।"

ঐ সাক্ষাৎকারেই হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আরো বলেন: "ঐ দলের প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে হয়েছিল এক-একজন দুর্ধর্ষ মুক্তি-সংগ্রামী।... তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে আমি এবং আমার বন্ধুরা সবাই দেশের মুক্তির জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলাম। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমরা কয়েকজন ঢাকায় 'মুক্তিসঙ্ঘ' গঠন করেছিলাম যা পরে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'—এ রূপান্তরিত হয় আরও বৃহৎ আকারে ব্যাপক কর্মসূচী ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে।...স্বামীজীর প্রেরণা আমাদের প্রত্যেককে একটি অখণ্ড এবং অচ্ছেদ্যবন্ধন সূত্রে চিরকালের জন্য বেঁধে দিয়েছিল।...তাঁর শরীরের অবস্থা তখন বিশেষ ভাল ছিল না এবং সারাদিন সবসময় তাঁর কাছে অসংখ্য দর্শন প্রার্থীর ভিড় লেগেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পরপর দুদিন আলাদাভাবে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং দীর্ঘসময় ধরে আমাদের সঙ্গে পরমস্নেহে কথা বলেছেন।...এমন আগ্রহের সঙ্গে বললেন যে, আমাদের তখন মনে হয়েছিল যেন আমরা তাঁর বাণীকে রূপদান করতে পারব, তাঁর আশা পূর্ণ করতে পারব।"

এই বিশিষ্ট বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ আবার "স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" নামে একটা আলাদা প্রবন্ধে লিখেছেন: "বীর সন্ন্যাসীর কাছে আমরা গিয়েছিলাম আমাদের পথনির্দেশ চাইতে।...সেদিন স্বামীজী পরমস্নেহে কাছে বসিয়ে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন।... সেদিন সেই পুরুষসিংহের মুখ থেকে নির্গত বীরবাণী আমাদের দেহ মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।...স্বামীজীর মধ্যে আমরা দেখেছিলাম প্রচণ্ড

দেশপ্রেমের প্রকাশ। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি, আমার দেশপ্রেমের প্রকৃত শিক্ষা তাঁরই কাছে পাওয়া। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হয়ে বুঝেছিলাম দেশের প্রতি ভালবাসা কাকে বলে। ভারতবর্ষের প্রকৃত জাগরণ এনেছিলেন তিনিই।"

সত্যিকারের সমাজসেবা, বিশেষতঃ গ্রামের লোকদের শিক্ষিত করে ও কৃষির উন্নতি করে সুস্থ ও সবল গ্রামীণ জীবন গড়ে তোলাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা। কৃষকদের শিক্ষার জন্য "কর্মশালা" গঠনের কথা তিনি বলেছিলেন। কৃষিবিজ্ঞান শেখার প্রয়োজনের কথা তিনি গভীরভাবে অনুভব করে বলেন: "দেশের কৃষকেরা ও বিশেষ করে ছাত্রেরা বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে কৃষি ব্যাপারে নানারকম শিক্ষা গ্রহণ করবে।" কৃষি শিক্ষার ব্যাপারেও যে শিক্ষামূলক ভ্রমণের বিশেষ ভূমিকা আছে তা যথার্থই উপলব্ধি করে তিনি বড় বেদনায় বলেছেন: "আমার যদি টাকা থাকত তোমাদের প্রত্যেককেই পৃথিবী পর্যটনে পাঠাতাম।"

কৃষকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও কৃষি গবেষণার প্রসার যাতে হয়, তার জন্য স্বামীজী বহু মূল্যবান পথ প্রদর্শন করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, কৃষি সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান প্রভৃতি চালানোর জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে কৃষি গবেষণা সংস্থা স্থাপিত হোক। এদের কাজ হবে নিয়মিত খবরাখবর ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি যোগান দিয়ে চাষীভাইদের সচেতন করা, যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এক চিঠিতে তিনি পরিষ্কার লিখেছেন: "চাই, প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া।"

আবার সাধারণ গরীব মানুষদের স্কুল-কলেজ বইপত্রের বদলে, মুখে মুখেই প্রথম দিকে শিক্ষা দিতে পারলে, যে সেটা বেশী ফলপ্রদ হয়, তার ওপর জোর দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন: "দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই, স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আসে নাই। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয় তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে।"

তারপর শিক্ষাদানের খুঁটিনাটি পদ্ধতিগুলি পর্যন্ত স্বামীজী তাঁর প্রাণবন্ত ভাষায় প্রকাশ করেছেন: "দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকা নির্মিত কুটির ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি জোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব, অনুন্নত, এমনকি চণ্ডালকে পর্যন্ত জড়ো কর; তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও।"

আমাদের সাধারণ দরিদ্র জনগণকে শিক্ষাদানের প্রধান প্রতিবন্ধকই হল, যে আবার তাদের দারিদ্র্য, সে কথা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখে তার প্রতিকারের উপযুক্ত উপায় উল্লেখ করেছেন: "ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া পিতাকে তাহার কৃষিকার্যে সহায়তা করিবে, অথবা অন্যকোন রূপে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করিবে; সুতরাং যেমন মহম্মদ পর্বতের নিকট না যাওয়াতে পর্বতই মহম্মদের নিকট গিয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালক যদি শিক্ষালয়ে আসিতে না পারে, তবে তাহাদের নিকট শিক্ষা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।" এমন কি তিনি এটাও বলেছেন যে, সাধারণ গরীব মানুষেরা যদি নিজেরা শিক্ষালাভে তৎপর নাও হয়, "তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সর্বস্থানে যাইতে হইবে।"

এইরকম সমাজসেবামূলক কাজে অগ্রসর হওয়ার পথে আর একটি অন্তরায় স্বামীজীর ধ্যাননয়নের নজর এড়ায়নি। তা হল আমাদের ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা। ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া যেন আমরা অন্য কিছু বুঝি না। ব্যক্তির সঙ্গে যে সমষ্টির যোগ কত নিবিড়, সে কথা আমরা ধারণা করতে পারি না। সমাজের কল্যাণ সাধন যে নিজের কল্যাণ সাধনেরই অনুরূপ, তা আমরা অনেক সময়েই ভুলে থাকি। অতএব এ ব্যাপারে বিবেকানন্দ আমাদের সতর্ক করতে সচেষ্ট হয়েছেন: "সমষ্টির জীবনে ব্যক্তির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত

সত্য জগতের মূলভিত্তি।" আরো স্পষ্ট করে তিনি আবার বলেছেন: "স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ, স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ।"

আমরা জানি স্বামীজী তাঁর পরিব্রাজক জীবনে ভারতের গ্রামীণ ও নাগরিক অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। উত্তর ভারত ভ্রমণকালে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হয়ে ঐ অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতি পর্যালোচনাকালে, ভারতের গরীব কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার বর্ণনা করতে গিয়ে, তিনি যে প্রেমাবেগে অভিভূত হয়ে যেতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিবেদিতার রচনায়: "আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত ক্ষেত, খামার, ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করার সময় তাঁহার প্রেম যেরূপ উথলিয়া উঠিত, অথবা তন্ময়তা যেরূপ প্রগাঢ় হইত, এমন আর বোধহয় কোথাও হয় নাই। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অখণ্ডভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন, এবং তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কিরূপে ভাগে জমি চাষ করা হয় তাহা বুঝাইয়া দিতেন। অথবা কৃষক গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করিতেন; তাহার আবার কোন খুঁটিনাটি বাদ যাইত না··· ।"

আবার ১৮৯১-৯২ সালে আজমীড়—মারওয়ার, গুজরাট, বেলগাঁও, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণকালে ঐসব জায়গার লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষ যে, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে দুর্বিষহ খাজনা, জমির ওপর জনসংখ্যার চাপবৃদ্ধি, জমিদার মহাজনদের অকথা অত্যাচার, সেচ ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতির ফলে শীর্ণ জীর্ণ নিঃস্ব ভিখারীতে রূপান্তরিত হচ্ছিল বা একেবারে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছিল, সে সব দুঃখ দারিদ্র্য ও অন্যায় অবিচার স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ হৃদয়কে জ্বালাময় করে তুলেছিল।

স্বামীজী দেখেছেন বহুক্ষেত্রে রাজা-মহারাজারা কৃষকদের অবহেলা করছেন। ঐসব ক্ষেত্রে তিনি, কি করে রাজ্যের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি করা যায় ও কিরূপে কৃষিজীবীগণের দারিদ্র্যমোচন করা যায় এবং তাদের শিক্ষিত করে তোলা যায়, সে সম্বন্ধে রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। ভুজ রাজ্যের দেওয়ানের সঙ্গে স্বামীজী রাজ্যের কৃষি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিক্ষাপ্রসারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গঠনমূলক আলোচনা

করেছেন। যদিও তিনি বুঝেছিলেন যে, সাধারণভাবে অভিজাত শ্রেণী জনসাধারণের আর্থিক অগ্রগতির জন্য সেরকম কিছু করতে আগ্রহী নয়, তবুও তাঁর সংস্পর্শে এসে বহু রাজা মানবকল্যাণের মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যখনই বুঝেছিলেন যে, সাধারণভাবে দেশের অভিজাত শ্রেণী জনগণের আর্থিক প্রগতির সম্বন্ধে সেরকম কিছু করতে আগ্রহী নয়, তখনই তিনি ব্যথিত হন। একটা চিঠিতে তাঁর এই তিক্ত মনোভাব স্পষ্টই ফুটে উঠেছে: "কোথায় ইতিহাসের কোন্ যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত ও ধর্মধ্বজিগণ দীনদুঃখীর চিন্তা করিয়াছে? অথচ ইহাদের নিষ্পেষণ করাতেই তাহাদের ক্ষমতার প্রাণশক্তি।"

এইসব দীন-দুঃখী অনাথ-আতুরদেরজন্যই স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণ কেঁদেছে। তিনি তাঁর "পরিব্রাজক" বইতে নিজস্ব ঢঙে লিখেছেন: "ঐ যারা চাষাভুষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মানুষ ··তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রম ফলও তারা পাচ্ছে না।" একই কথা রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর আগে ১৯৪১ সালে "ওরা কাজ করে" কবিতায় সুন্দরভাবে প্রতিধ্বনিত করেছেন:

"ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।"

স্বামীজী যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, এইসব নগণ্য লোকই নীরবে দেশের ধনধান্য উৎপাদন করে চলেছে, অথচ তারাই বঞ্চিত ও অবহেলিত। তাই এই শূদ্রজাগরণেই ছিল স্বামীজীর অসীম আগ্রহ।

আমরা আজকাল গ্রামোন্নয়নের কাজে নানাভাবে নিযুক্ত। সরকারী ও বেসরকারী, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশন ও অনুরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ

ব্যাপারে প্রভূত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ঐসবের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতীয় কৃষি তথা গ্রামোন্নয়নের জন্য যে সব পথ প্রদর্শন করেছেন, সেগুলির যথেষ্ট মিল খুঁজে পাই। তথাপি আশানুরূপ ফল না পাওয়ার কারণ, আসল আদর্শের অভাব।

অতএব স্বামীজীর বাণীগুলির অন্তর্নিহিত আদর্শই আমাদের বল-ভরসা। তাই যে ভারত গ্রামের গরীবদের মধ্যে লুকিয়ে আছে সেই ভারতের প্রতিটি গ্রামবাসী ও গ্রামোন্নয়ন কাজে নিযুক্ত কর্মী তথা সমগ্র ভারতবাসী যদি তাঁর ঐসব বাণীর অর্থ ও আদর্শ অকৃত্রিমভাবে অনুধাবন করতে পারে তবেই মঙ্গল।

সুতরাং যৌবনের মূর্তপ্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ই জানুয়ারীটি যখন আজকাল "জাতীয় যুবদিবস" হিসেবে পালিত হচ্ছে, তখন সেই দিনটির উপযুক্ত সম্মানের কথা স্মরণ করে সকলেরই, বিশেষতঃ যুব সম্প্রদায়ের উচিত এই মুহূর্তেই তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে শপথ গ্রহণ করা এবং তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও প্রেরণা প্রার্থনা করা, যাতে সমাজসেবার সকল কাজে সফল হওয়া যায়।

নিবেদিতার গ্রামোন্নয়ন চিন্তা

"It has been said that man's only right is to do his duty. But this implies that his right is also to do his whole duty. And what is true of individual is true of communities. The people of a country has an inalienable right to do the whole work of their country."
—**Sister Nivedita**

যিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা, তিনি রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা, তিনিই অরবিন্দের শিখাময়ী এবং তিনিই আবার অবনীন্দ্রনাথের মহাশ্বেতা। সুদূর আয়ারল্যাণ্ডের মানুষ মিস্ মার্গারেট নোবেলের এই বিশেষ নামকরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁর কাজের পরিধি কত ব্যাপক এবং উদ্দেশ্য কত মহৎ ছিল। তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ধর্মকে নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন কর্মের মাঝে।

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে এখানকার সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের সমস্যার কথা ভালভাবে বুঝে সেগুলির সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষকে প্রত্যক্ষ করি নাই।...তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষের জন্য দান করিয়াছিলেন, নিজের জন্য কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই।"

তাই কৃষি প্রধান ভারতবর্ষের একজন দরদী সমাজসেবিকা হিসাবে নিবেদিতা তাঁর কর্মসূচীতে কিষাণ সমাজের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে মোটেই ভোলেন নি। কৃষকদের তিনি দেশের 'ধনসম্পত্তির উৎস' বলে বর্ণনা করেছেন। ১৯০৬ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও বন্যা সম্পর্কে এক প্রবন্ধে তিনি কৃষি জীবনের সমস্ত অর্থনৈতিক খুঁটিনাটি ব্যাপার আলোচনা করেছেন। তাতে বোঝা যায় যে, পূর্ববঙ্গের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামবাসীর আর্থিক দুর্গতি তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন এবং কঠোর পরিশ্রমে এইসব নর-নারায়ণের সেবা করে দেশের জনসম্পদকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দেশের খাদ্যাভাবের সময় ভোগপ্রকৃতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে

নিবেদিতা তাঁর ঐ প্রবন্ধে বলেছেন: "অন্যান্য খাদ্য অবশ্য কিছু পরিমাণে পরিবর্ত খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

কিন্তু এইভাবে পরিবর্ত দ্রব্য ভোগের পরিমাণ বেড়ে গেলে তার আবার মূল্যবৃদ্ধি পাবার একটা অর্থনৈতিক যুক্তি যে থাকে তাও নিবেদিতার নজর এড়ায়নি, কারণ তিনি বলেছেন: "বর্ধিত চাহিদার সময় গমের দরও চালের সমান তালে বেড়ে চলেছে।" দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভগিনী নিবেদিতা বলেন: "আমরা দেখেছি যে, দুর্ভিক্ষের আসল কারণ হল ফসলহানির চেয়েও সংগৃহীত ফসল নিঃশেষ হওয়া।" সুতরাং যেহেতু সংগৃহীত শস্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সেহেতু এর প্রতিবিধানকল্পে তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন: "জমান চাল তুলে খরচ করে ফেলার বদলে আরো জমিয়ে রাখতে হবে" এবং এর জন্য যে প্রয়োজন প্রচণ্ড শ্রমের সে বিষয়েও তিনি হুঁশিয়ার করে দেন।

আবার জমির উর্বরতা ও ভাল চাষের দরুন যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অথচ বেশী রফতানি করতে না হয় তবে চালের দাম যে কমে সে সম্বন্ধেও তাঁর ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তারপর কৃষকরা কিভাবে অর্থের মূল্য বুঝতে শিখল এবং মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা ও কর দিতে আরম্ভ করল এইসব কৃষি অর্থনীতি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং পূর্ববঙ্গে পাটের বহুল প্রসার, তার অর্থনৈতিক মূল্য এবং উৎপাদনের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধেও অনেক কথা তিনি লিখেছেন। পাটের বর্তমান আয়ের লোভে পূর্ববঙ্গের চাষীরা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করায় ধান উৎপাদনের ভাল ভাল জমিগুলিকে কিভাবে পাট উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে দুর্ভিক্ষের মত এক অর্থনৈতিক দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তার সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা তাঁর লেখার মধ্যে পাই।

চাষীদের ওপর অধিক কর চাপানো হলে তাদের মাথা পিছু উৎপাদন যে হ্রাস পায় তার কারণ হিসাবে তিনি সহজ অর্থনৈতিক যুক্তি দিয়ে বলেছেন, যেহেতু কর প্রদানের অর্থ বীজধান, বলদ বিক্রি করে যোগাড় করতে হয় সেইহেতু জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করার মত উপযুক্ত জিনিসের অভাব হয়ে পড়ে।

এইভাবে নিবেদিতা কৃষি অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যথেষ্টই মাথা ঘামিয়েছেন এবং পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন যাতে "চাল উৎপাদনের প্রসার ঘটানোর জন্য শহরে শহরেও সঙ্ঘ গড়ে তোলা যেতে পারে।" বিদেশী দ্রব্যের অপসারণ করে ধান চাষের জন্য তিনি খুব প্রেরণা দিতেন। এর জন্য তিনি পাট উৎপাদন বন্ধ করতে পরামর্শ দিয়ে বলেন: "অর্থ কখনও চালের পরিবর্ত দ্রব্য নয়," কেননা পাটে শুধু অর্থ আসবে, দেশের খাদ্যাভাব ঘুচবে না। তিনি আরো বলতেন: "যন্ত্রপাতি ও গবাদি পশু কেনার জন্য মূলধন কম সুদে ধার দিতে হবে", যাতে চাষীরা দেশের খাদ্যোৎপাদনে যথেষ্ট উৎসাহী হয়ে ওঠে।

ভগিনী নিবেদিতা যে বলেছিলেন ভারতবর্ষ তার কৃষি কাজে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে শীঘ্রই আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কারিগরি বিদ্যা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে, এখন সেই ভবিষ্যৎবাণী কার্যকর হচ্ছে, কারণ বর্তমান ভারতে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রের দ্রুত সংস্কার ও আধুনিকতা প্রবর্তনের কথা বেশি করে চিন্তা করা হচ্ছে। তিনি আরো মনে করতেন যে, ভারতে এমন অনেক কাজ করার আছে যেগুলি দেশীয় রাজ্যগুলি নিজেদের উদ্যোগে হাতে নিতে পারে যেমন, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা, বৃক্ষরোপণ, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, খাল খনন ও সংস্কার এবং রেলপথ স্থাপন প্রভৃতি। এগুলি যে কোন আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একেবারে অপরিহার্য অঙ্গ।

আমাদের দেশে বহু অতিরিক্ত কর্মক্ষম লোক অযথা বসে বসে দারিদ্র্য পীড়িত হয়। তার ওপর আবার কৃষিক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ও ঋতুগত বেকারত্বের প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং এইসব বেকার মানুষদের যদি ওই সমস্ত কাজে নিয়োগ করা যায় তবে ভারতের মত এক জনবহুল কৃষিপ্রধান দেশে এক সঙ্গে বহু সমস্যার সমাধান হয়। তবে এর জন্য নিবেদিতা যুবকদের আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা "গ্রামীণ মিশন"-এ অবতীর্ণ হয়ে গ্রামের সমস্ত দুর্গতি দূর করতে এগিয়ে আসে।

বৃটিশ শাসকেরা ভারতীয় কৃষকদের এবং সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতিকে

অবহেলা করে রাখার দরুণ নিবেদিতা দুঃখ করে বলেছেন : "এটা তাদের পক্ষেই সম্ভব যাদের জমির সঙ্গে কোন চিরস্থায়ী যোগসূত্র নেই।" তাই এই ভারতকে স্বাধীন করে তার নিজের আর্থিক উন্নতির দায়িত্ব নিজের হাতে দিতে পারলে ভারতের বিপুল প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদকে চিরস্থায়ী উন্নতির কাজে নিয়োগ করার চেষ্টা ভারতবাসীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে উদ্ভূত হবে। এই ব্যাপারে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসার কথা আমাদের স্মরণীয়।

স্বদেশী আন্দোলনের গোড়া থেকেই নিবেদিতা স্বদেশী বস্তু ব্যবহার করতেন। স্বদেশী কাগজ, কালি, কাপড়, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। কৃষকরা যাতে অবসর সময়ে কাজ করে তাদের বিশেষ ধরণের বেকারত্ব ঘোচাতে পারে সেজন্য গ্রামের ছোট ছোট কুটির শিল্পের প্রচলনের ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। কাঁচামালের আমদানি ও রফতানির জন্য তিনি বহু স্থানে আড়ৎ গড়ে তুলেছিলেন। ভারতের বহু ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁর সহায়তায় স্থাপিত হয়েছিল।

মহাত্মাজী প্রবর্তিত চরকা আন্দোলনের আগে থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের চরকা কাটা শেখাবার ব্যবস্থা করেন। ১৯০৬ সালে কলকাতার স্বদেশী মেলা বসার ব্যাপারে নিবেদিতার ভূমিকা মনে রাখার মত। এইভাবে শহরের সঙ্গে গ্রামের একটা সংযোগ স্থাপন করে সমস্ত দেশে তিনি উচ্চ আদর্শ ও নবভাবধারা বিস্তার করে সঙ্ঘবদ্ধ হতে সর্বদা প্রেরণা জুগিয়েছেন।

ভগিনী নিবেদিতার সমস্ত চিন্তাধারার মূলনীতিই হচ্ছে সমবায়। সমবায় সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে আমরা তাকে স্পষ্ট বলতে দেখি : "আমি বিশ্বাস করি, যদি ঠিকমত প্রতিপালিত হয়, ভারত এখন এমন একটা সময়ের মধ্যে প্রবেশ করছে যাতে তার আদর্শ হবে পারস্পরিক সাহায্য—আত্মসংগঠন ও সমবায়।" ছোট বড় সব রকম কাজেই তিনি চেয়েছিলেন যে, তাঁর ভারতবাসী ভাইবোনেরা পরস্পরের সঙ্গে একটা আদর্শে মিলিত হয়ে সমস্ত সামাজিক সমস্যার সমাধান করুক। কি কৃষি উন্নয়ন, কি শিল্পবিস্তার, কি

অন্নদান, কি রোগমুক্তি যে কোন কাজেই যদি দলে দলে সব নিষ্ঠাবান উৎসাহী যুব সম্প্রদায় সমবায়ের আদর্শে লেগে চলতে পারে তবে ভারতের দুর্দশা অচিরেই দূর হবে।

সুতরাং স্বদেশীর প্রেরণায় স্থাপিত সমবায় সমিতিগুলির সম্প্রসারণ এবং সেগুলি যাতে অল্প সুদে ঋণ পায় সেদিকেও নিবেদিতার লক্ষ্য ছিল। তিনি মনে করেন যে, সরকারী কর্মচারী, সাধারণ কেরানী, কৃষক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী যদি কোন সৎ সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করে, তবে অনেক ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। এজন্য তিনি ডেনমার্কের সমবায় নীতির ইতিহাস পড়ে দেখতে বলেছেন।

বর্তমান ভারতে সামাজিক কাঠামোর কথা বিবেচনা করে এই সমবায় প্রথার ওপর আবার বেশ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কারণ সমবায়ই হচ্ছে এই বিকেন্দ্রিত সমাজবাদের অর্থনৈতিক বিন্যাসের মধ্যমণি। তাই এখন দেখা যাচ্ছে সমাজের প্রায় সর্বস্তরেই সমবায় নীতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তথাপি আমরা কেন আমাদের সেই দারিদ্র্যের ভয়াবহ দুষ্টচক্র থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি না। তার কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের অন্তর্নিহিত আদর্শে কিছু ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

অথচ ভগিনী নিবেদিতা চেয়েছিলেন এমন এক ধরণের সমবায় যা সর্বপর্যায়ের মানুষকে মহৎ কর্মে প্রেরণা দেবে এবং যেখানে থাকবে না কোন আদর্শের সঙ্কীর্ণতা। সুতরাং যতদিন না আমরা তাঁর এই মূল ভাবকে আমাদের ব্রতের অঙ্গ হিসাবে নিতে পারব, ততদিন আমাদের মোহমুক্তি ঘটবে না।

অতএব, ভগিনী নিবেদিতা, তাঁর নিবেদিত প্রাণ দিয়ে যে ত্যাগ ও সেবার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন, তা স্মরণ করে তাঁরই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এক ছাত্রী সরলাবালা সরকারের সঙ্গে এক সুরে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বলি :

“এস ত্যাগ, এস প্রীতি, এস পুণ্যময়ী স্মৃতি,
চিত্তে বিজড়িতা !
এস পূর্ণতান বীণা, রামকৃষ্ণপদে লীনা
চির নিবেদিতা।”

॥ বার ॥

গান্ধীজী ও গ্রামীণ অর্থনীতি

"In my picture of the rural economy the cities would take their natural place."

—M. K. Gandhi

মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক ভাবনা একটু বিশেষ ধরণের। তিনি প্রথাগত পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক চিন্তায় চালিত হন নি। অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার দাবীও তাঁর নেই। প্রচলিত অর্থনীতিবিদ্‌দের মতো তিনি আর্থিক সমস্যাকে দেখেন নি। আধুনিক অর্থনীতিতে এমন কিছু জটিল বিষয় আছে, যেগুলির দিকে তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করেন নি। ব্যাঙ্ক, মুদ্রা, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান, বিদেশী দ্রব্যের আমদানী—রপ্তানী ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নি তিনি। তিনি পরিষ্কার স্বীকার করেছেন: "আপনারা যে দৃষ্টিতে অর্থনীতিকে দেখেন, সে দৃষ্টিতে আমি অনভিজ্ঞ।"

ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির আলোকেই গান্ধীজীর অর্থনৈতিক ভাবনা আলোকিত। তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনার মূল কথা হ'ল অর্থের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক বোধের উদ্বোধন। তাই তিনি বলছেন: "আমি সবিনয়ে আমার এই চিন্তাধারা শোনাব যে, আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলি মামুলী অর্থবিজ্ঞানের বইগুলির তুলনায় অর্থনীতি সম্বন্ধে বেশী নির্ভরযোগ্য।"

গান্ধীজীর চিন্তা ও কর্মে অর্থনীতি সর্বদাই মানব কল্যাণের কাজে নিয়োজিত। তাঁর কথা: "যে অর্থনীতিতে নৈতিক মূল্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয় তা মিথ্যা।" তিনি আরো বলেন: "অর্থনীতি শাস্ত্র এবং সুনীতিশাস্ত্রের মধ্যে আমি সূক্ষ্ম অথবা কোনরকম প্রভেদ দেখতে পাই না।" তাঁর মতে, সমগ্র মানুষের জীবনে অর্থের যেমন দরকার আছে, তেমন আবশ্যক আছে সমাজ, জাতীয় ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ও ধর্মের।

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক ভাবনার আসল বিষয়গুলি হচ্ছে গরীবদের অবস্থার উন্নতি ও ধনীদের মনোভাব বদলের মাধ্যমে জনসমাজে আর্থিক সাম্যসৃষ্টি করা; আর মালিকশ্রেণীকে সমাজের অন্য শ্রেণীর অভিভাবক

বা ট্রাস্টী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত করে কুটিরশিল্পের, বিশেষতঃ চরকার প্রচলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিকেন্দ্রিত করা এবং কৃষি উন্নয়ন করা ও গ্রামীণ সমাজকে যথাসাধ্য স্বয়ংভর করে তোলা।

গান্ধীজীর পরিকল্পিত সমাজ গড়তে হলে সমগ্র কাঠামোটি ধরে সমাজের রূপ বদল করা চাই। তাঁর মতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে একদম গ্রাম থেকে আরম্ভ করে ঢেলে সাজাতে হবে। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার মূল বিষয়ই হল ভারতীয় গ্রাম। গান্ধীজী সমাজের দীনতম মানুষদের, যারা ওপরতলার রাজনীতি বোঝে না, তাদের দ্বারে পৌঁছে, তাদের নিয়েই শুরু করেছিলেন তাঁর কর্মযজ্ঞ, ভাবনা-চিন্তা ও সংগ্রাম। এইভাবেই দেখা যায় তাঁর 'সর্বোদয়'—এর সর্বোচ্চ আদর্শের সূচনা এবং "অন্ত্যোদয়"-এর প্রয়োগ।

তাই গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত আশ্রমগুলিতে ভারতের গ্রামগুলির অবস্থা অনুযায়ী সাম্যবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এইভাবে যে, ঐসব জায়গায় প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুসারে দ্রব্যাদি দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে তার যোগ্যতানুযায়ী কাজ আদায় করা হবে।

ভারতের জাতীয় জীবন যে গ্রামে গরীবদের ঘরেই লুকিয়ে আছে, স্বামী বিবেকানন্দের এই কথা গান্ধীজীও মনেপ্রাণে গ্রহণ করে তাঁর 'সর্বোদয়' বিপ্লবের কাঠামো গড়েছিলেন। তিনি মনে করেন গ্রামগুলোকে আবার স্বাশ্রয়ী ও স্বাধীন করা চাই। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কুটির শিল্পের প্রবর্তন করে পুরানো সেই দিনের মতো অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। কয়েকটা গ্রাম নিয়ে এক একটা ছোট ছোট স্বাবলম্বী অর্থনৈতিক কেন্দ্র গঠন করা প্রয়োজন। সেখানকার উৎপাদিত দ্রব্য প্রধানতঃ ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেই উপযুক্তভাবে বণ্টিত হবে। তিনি স্পষ্টই বলেন: "আদর্শগতভাবে আমি সমবণ্টন চাই। কিন্তু যতদূর সম্ভব মনে হয় ঐ আদর্শ কোনদিন সফল হবে না। আমি সেইজন্য উপযুক্ত বণ্টনের পক্ষপাতী।" তিনি চান ভাত কাপড়ের জন্য যেন কাউকে পরমুখাপেক্ষী হতে না হয়। কৃষক নিজেই হবে জমির মালিক।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ হল, প্রতিটি গ্রাম নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের মতো বস্ত্রের ব্যাপারেও নিজেদের জন্য সূতো কেটে কাপড় বুনে নেবে। তিনি খুব জোর দিয়েই বলেছেন: "আমার দৃঢ় বিশ্বাস চরখা ও হস্তচালিত তাঁতের পুনরুদ্ধারের দ্বারা ভারতের আর্থিক ও নৈতিক পুনরুত্থানের কাজে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাহায্য প্রদান করা হবে। কোটি কোটি লোকের কৃষিকাজের আয়ের আরও বৃদ্ধির জন্য কোনও একটি সহজ শিল্পের প্রয়োজন। বহুবছর পূর্বে চরখা সেই কুটির শিল্পের স্থান অধিকার করেছিল।" তাঁর মতে কোটি কোটি লোককে অনাহারজনিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ঘরে ঘরে চরখা আবার শুরু করতে হবে এবং গ্রামে গ্রামে তাঁত চালাতে হবে। যাদের এই অনাহারের কবলে পড়তে হয় সেইসব কোটি কোটি মানুষর জন্যই তিনি খাদির পরিকল্পনা করেন।

আমরা জানি গান্ধীজী জে. সি. কুমারাপ্পার মতো একজন বড় অর্থনৈতিক চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টের সাহায্যে কর ও শুল্ক ব্যবস্থার সূত্রে বৃটিশের ভারতশোষণের একটা জ্বলন্ত তথ্যচিত্র তৈরী করিয়েছিলেন এবং তাঁকে গ্রামীণ ভারতের একনিষ্ঠ কর্মীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। বর্ণ-বৈষম্য গান্ধীজী সহ্য করতে পারতেন না। ধন উৎপাদনকারী গ্রামবাসীরা উৎপন্ন-ধনের অধিকার পাবে না, আর বিদেশী আমলাতন্ত্র ও শহরবাসী বাবু ও জমিদার শ্রেণী গ্রামের গরীবদের শোষণ করছে, এটা তাঁর মতে খুবই লজ্জাকর এবং অনুচিত। তাঁর এই আদর্শ রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর "গান্ধী মহারাজ" কবিতায়:

"গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ-বা ধনী, কেউ-বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাইনে পেট,
ধনীর কাছে হইনে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।"

গান্ধীজীর কথাই হল: "রাজা ও দীনদরিদ্র প্রজার অবস্থার মধ্যে যে

আকাশ-পাতাল পার্থক্য ; তাকে যেন কেউ এই কথা বলে বরদাস্ত না করেন যে, একের প্রয়োজন অপরের চেয়ে অধিক।" তাই তাঁর অভিমত : প্রত্যেকের জন্য পুষ্টিকর আহার্য, সুন্দর বাসস্থান, শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।"

গান্ধীজী এই আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ঘৃণা ও হিংসার মাধ্যমে নয়, প্রেমের টানে মানুষকে বুঝিয়ে সুজিয়ে অহিংসার পথ ধরে। তাই তাঁর উপদেশ : "জমিদারের কাছে স্পষ্ট ভাষায় একথা বলতে ছাড়বে না যে, যারা জমি চাষ করে তারাই জমির মালিক।" তিনি সর্বদাই ধনী জমিদারদের মনোভাবের পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। চেষ্টা করেছেন তাঁদের সমাজের অভিভাবক বা ট্রাস্টী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি মনে করেন যে, ওরা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে সমস্ত সম্পদ সংরক্ষণ করবেন ও জনগণের কল্যাণে ব্যয় করবেন। তাঁর এই মতবাদ ধনিক-মালিকের শুভ বুদ্ধি উদয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এমন একটা আদর্শ অবস্থায় শোষণের হবে অবসান।

যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীজির অভিমত নিয়ে অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় ; অথচ তাঁর কথা তো স্পষ্ট : "না, আমি যন্ত্রের বিরোধী নই। কিন্তু যদৃচ্ছভাবে যন্ত্রের প্রসার হয়, তা আমি চাই না। আমি সাধারণ সরল যন্ত্রপাতির প্রবর্তন চাই।" তাঁর যুক্তিও খুব পরিষ্কার। তাঁর মতে, এতে গ্রামবাসীর পরিশ্রম লাঘব হবে। আবার যন্ত্রের সাহায্যে যে, কিছু লোক লক্ষ লক্ষ মানুষকে পদানত করে রাখে, তারও মুক্তি ঘটবে।

আমরা জানি যে, গান্ধীজী বহুবার আমেদাবাদের মিলগুলিতে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের মীমাংসা করেছেন। যান্ত্রিক বস্ত্রশিল্পের ওপরে আবগারি শুল্ক চাপানোর বিরোধিতা তিনি করেছেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি যান্ত্রিক বস্ত্রশিল্পের বিরোধী নন। তাঁর বক্তব্য : "আমি চাই মিলগুলি সমৃদ্ধ হোক, কিন্তু তাদের সমৃদ্ধি যেন দেশের স্বার্থের পরিপন্থী না হয়।"

মহাত্মা গান্ধীর কাছে জাতীয় স্বার্থই খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আর এজন্য তিনি সবথেকে জটিল যন্ত্রের প্রয়োগকেও স্বাগত জানাতে কুণ্ঠিত নন।

তাঁর দৃঢ় ঘোষণা ঃ "আমি সবচেয়ে জটিল যন্ত্রের ব্যবহারেরও পক্ষে থাকব, যদি তা দিয়ে ভারতের দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা দূর করা যায়।" তাই গান্ধীজীর অর্থনৈতিক ভাবনাকে শুধু চরকা বা কুটিরশিল্পের পথ বলা ঠিক হবে না।

আমাদের মিলগুলি যে, আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট উৎপাদন করতে পারে না, সে কথা গান্ধীজী বুঝেছেন এবং বিকেন্দ্রিত উৎপাদনের পক্ষে এটা বড় যুক্তি। আর একটি যুক্তি হল, সারা দেশে ছড়ানো কাঁচামাল ও শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা। ভারতের মত দেশে, যেখানে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব ব্যাপক, সেখানে যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্প পরস্পর পরিপূরক, বিকল্প নয়। তাঁর মতে, চরকা হল আমাদের পরিপূরক শিল্প।

গান্ধীজী চেয়েছেন এই বিরাট দেশের উৎপাদন শক্তিকে বিকেন্দ্রিত করতে। চেয়েছেন গ্রামের ঘরে ঘরে উৎপাদন কেন্দ্র বসিয়ে দিতে। আর বলেছেন যে, আমাদের যা কিছু দরকার, আমরা তা সমবায় প্রয়াসের মাধ্যমে উৎপাদন করব। তাঁর বিশ্বাস, সমবায় বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা করবে এবং এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গান্ধীজীর ধ্যানের ভারতের লক্ষ্যই হল বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি ও নৈতিক বল।

কেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির যান্ত্রিক চাপে মানুষের মায়া-মমতা, স্নেহ-সহানুভূতি, প্রেম-প্রীতি প্রভৃতি যাতে উধাও হয়ে না যায়, সেজন্য গান্ধীজী বারবার বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির ওপর জোর দিয়েছেন। কেন্দ্রীভূত যন্ত্র দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য সস্তা ঠিকই; কিন্তু আমরা তো দেখেছি যে, গান্ধীজীর কাছে মূল্যবোধের মাপকাঠি অর্থ নয়। মানুষের জীবন ও ব্যক্তিত্বই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। তাঁর বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা এই কেন্দ্রিকতারই মূর্ত প্রতিবাদ।

একমাত্র বিকেন্দ্রীকৃত সমাজেই মানুষ ইচ্ছামত নিজের কর্মক্ষমতা ও রুচিকে পরিচালনা করতে পারে, কেননা সেখানে যন্ত্রের দরকার নেই। যন্ত্র যদিও বা থাকে তার মালিক ও শ্রমিক একই ব্যক্তি। এখানে কোন জুলুমের জায়গা নেই। মানুষের জৈব অস্তিত্বের দাবী মেটাবার

জন্য যন্ত্রের দরকার আছে নিশ্চয়। কিন্তু তার সার্থকতা সেখানে, যেখানে সে ব্যক্তিজীবনকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও সচ্ছল করে কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত। তাইতো গান্ধীজীকে বলতে শুনি : "সাধারণের মঙ্গলার্থ কিছু বৃহৎ যন্ত্রশিল্প অবশ্যই থাকবে। কারণ ঐসব কাজ ব্যক্তিগত শ্রমসাধ্য নয়। কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐসব যন্ত্র রাষ্ট্রের অধীনে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত হবে।"

গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস মরণাপন্ন গ্রামের পুনর্জাগরণের মাধ্যমেই বেঁচে উঠবে গোটা ভারতবর্ষ। তাঁর কথাই হ'ল : "গ্রামগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলে ভারতবর্ষও নিশ্চিহ্ন হবে।" তিনি ভারতের গ্রামগুলিকে এমনভাবে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন, যাতে কৃষি ও পল্লীশিল্পের মধ্য দিয়ে সেগুলি স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তিনি জানতেন যে, এদেশের আপামর জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিহিত রয়েছে শুধুমাত্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামের মধ্যেই। স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের পরিকল্পনাও করেছিলেন তিনি। তিনি কৃষকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথাই ভেবেছেন। আর ঐ 'স্বনির্ভরতা অর্জনের উপায় হিসাবে বুদ্ধি দিয়েছেন গ্রামসমীক্ষা করার এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করার মতো ও গ্রামেই ব্যবহৃত হবে বা বাইরে বিক্রি হবে এমন সব জিনিসের তালিকা তৈরী করার।

মোট কথা, মোটা ভাত, মোটা কাপড় আর সামান্য বাসস্থানই হ'ল, গান্ধীজীর গ্রামীণ অর্থনীতি ভাবনার মূল সুর। তাঁর মতে এই অর্থনীতি শুধুই প্রতিযোগিতার, বাজার সম্প্রসারণের ও কাঁচামালের অর্থনীতি নয়— এ হচ্ছে মানুষের সহযোগিতা বোধ সম্প্রসারণের অর্থনীতি। ভারতের গ্রামে গ্রামে প্রাণের সংসর্গ বেড়ে চলুক, এটাই ছিল মহাত্মা গান্ধীর একমাত্র অভিপ্রায়।

॥ তের ॥

গান্ধীজী ও কিষাণ

"If the village perishes India will perish too. It will be no more India. Her own mission in the world will get lost."

—M. K. Gandhi

গান্ধীজী কিষাণদের সমস্যা সম্পর্কে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পরে তিনি ভারতবর্ষের জনজীবনের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই সম্মুখীন হলেন কিষাণসমস্যার। ১৯১৬ সালে গান্ধীজী যখন লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসে যোগদান করেন তখন ওখানে রাজকুমার শুক্ল নামে চম্পারণের একজন নিরক্ষর, কিন্তু দৃঢ় সংকল্প, সরল কৃষক বিহারে নীলকরের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী তাঁকে শুনিয়ে আমন্ত্রণ জানায় এবং শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। গান্ধীজী বলেন: "১৯১৭ সালের প্রথমে কলিকাতা হইতে আমরা দুইজন রওনা হইলাম। দুইজনকেই চাষীর মতো দেখাইতেছিল। রাজকুমার শুক্ল যে গাড়িতে লইয়া গেল সেইখানেই দুইজনে বসিলাম।"

এই ব্যাপার থেকেই বোঝা যায় যে, মহাত্মাজী রাজকুমার শুক্লর মতো একজন সাধারণ কৃষকের সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদ এবং হাবভাবে একদম মিশে গিয়েছিলেন। এটাই তো তাঁর বিশেষত্ব, কেননা 'সর্বোদয়'-এর সিদ্ধান্ত তিনি এইরকমই বুঝেছেন যে, সাধারণ কৃষক ও মজুরের জীবনই হল আদর্শজীবন।

যাইহোক, ১৯১৭ সালের প্রথম দিকে তিনি বিহারে গিয়ে প্রজাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে থাকেন এবং গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে সমস্ত খবরাখবর নিতে থাকেন। গান্ধীজী যেদিন মতিহারী পৌঁছুলেন সেইদিনই শুনলেন যে, ওখান থেকে পাঁচমাইল দূরে এক চাষীর উপর প্রচণ্ড অত্যাচার হয়েছে। তখনই তিনি ঠিক করলেন যে, সকালে ধরণীধর প্রসাদ উকিলকে সঙ্গে নিয়ে তাকে দেখতে যাবেন। সকালে তাঁরা হাতির পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন। মাঝামাঝি রাস্তা গেছেন এমন সময়ে তিনি চম্পারণ পরিত্যাগ

করে যাবার সরকারী নিষেধাজ্ঞা পেলেন; কিন্তু তা অমান্য করলেন। পরের দিন আদালতে হাজির হবার হুকুম দিল।

গান্ধীজীর বিচার হবার খবর রটে যাওয়ায় হাজার হাজার প্রজা আদালতে জমায়েত হল। তখন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর বিচার বন্ধ করতে হুকুম দিয়ে গান্ধীজীকে বিনাবাধায় অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে অনুমতি দেন। অনুসন্ধানের কাজ চালাতে চালাতে তিনি কিষাণদের সত্যাগ্রহের নীতি শিক্ষা দেন এবং তাঁদের বুঝতে শেখান যে, স্বাধীনতার প্রথম শর্তই হচ্ছে নির্ভীক হওয়া। তিনি অশিক্ষিত ও সরল কিষাণদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যজ্ঞানের এবং তাঁদের সন্তানদের জন্য বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা করতে থাকেন। জনসাধারণকে তিনি তাঁদের অধিকারের জন্য যেমনি লড়াই করতে শেখান, তেমনি তাঁদের যাঁর যাঁর নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতেও উপদেশ দেন। তাঁর কথাই ছিল যে, স্বাধীন মানুষদের তাঁদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখতেই হবে।

যাহোক্, তারপর গান্ধীজীকে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে অত্যাচার-মূলক প্রথা বন্ধ করা হয়। গান্ধীজীর সঙ্গীসাথীরা চম্পারণে গঠনমূলক কাজকর্ম করতে থেকে গেলেন। তিনকাঠিয়ায় নীলকর জুলুমের অবসান ঘটল। ১৯১৮ সালের মার্চমাসে চম্পারণ কৃষি আইনের বলে এর নিষ্পত্তি হয়।

ভারতে এটাই ছিল প্রথম ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং তা হল কিষাণদের নিয়েই। গান্ধীজীকে এর জন্য সত্যাগ্রহ পর্যন্ত করতে হয়েছিল, যার জন্য এর নাম বিখ্যাত চম্পারণ সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহের অন্যতম নেতা ছিলেন পাটনার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রী ব্রজকিশোর বাবু। চম্পারণেই সর্ব প্রথম ভারতে সত্যাগ্রহের পরীক্ষা হয়। তা একটা গণআন্দোলনের রূপ নেয়। এটা আগাগোড়া সম্পূর্ণ অহিংসাই ছিল। প্রায় ২০লক্ষ কিষাণ এতে জড়িত ছিল।

এমন এক বিশেষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামটি করা হয়েছিল, যা চলে আসছিল এক শতাব্দীকাল থেকে। এই অন্যায়ের প্রতিবিধান কল্পে

কয়েকবার হিংস্রবিপ্লবও হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই তা দমিত হয়েছে। অংহিস সংগ্রাম কিন্তু ৬ মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হয়েছিল। ওখানকার ব্যাপারের সঙ্গে ক্ষমতাশালী লোকদের বহুদিনের স্বার্থ জড়িত ছিল। তাঁদের বিরোধিতার জন্য শুধুমাত্র সত্যাগ্রহের উদ্যোগে কাজ হয়নি, যুদ্ধই করতে হয়। তবে ওখানকার মানুষ যেরকম শান্ত ছিল, তা বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য, সেখানকার নেতারা যে কায়মনোবাক্যে অহিংস ছিলেন, সে কথার সাক্ষী তো গান্ধীজী নিজেই এবং এজন্যই ৬ মাসের মধ্যেই সেই বহু পুরোনো অন্যায় অবিচারের প্রতিবিধান করা সম্ভবপর হয়েছিল।

চম্পারণ শেষ হতে না হতেই গুজরাট থেকে ডাক আসে খেড়া তালুকের প্রজাদের দুঃখদুর্দশার প্রতিবিধান করবার জন্য। সেখানে অজন্মার ফলে প্রায় দুর্ভিক্ষের মতো শোচনীয় অবস্থা হয়ে ওঠে। প্রজারা সরকারের কাছে এর প্রতিকারকল্পে নানাবিধ আবেদন নিবেদন করেও কোন সুবিধা করতে পারে না। তখন তারা মহাত্মা গান্ধীর শরণাপন্ন হয়। তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শাদি করেন। পটিদারগণকে সত্যাগ্রহ করতে বলা হল। নাদিয়াদ অনাথ আশ্রমে কার্যালয় স্থাপন করে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করার ব্যবস্থা হয়। ১৯১৮ সালের মার্চমাসের ২২ তারিখেই সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তাঁদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত হতে দেবে, কিন্তু যতদিন না পর্যন্ত মিটমাট হয় ততক্ষণ খাজনা দেবে না। খেড়ার লোকেদের স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্রে ধ্বনিত হয়: "...আমাদের জমি যদি বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবে তাহা করিতে দিব। তবুও আমরা হাতে তুলিয়া সরকারকে খাজনা দিয়া আমাদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিয়া আত্ম-সম্মান খোয়াইব না।..."

সরকার কঠোর মনোভাবের সঙ্গে প্রজাদলন শুরু করে। তাদের গবাদি পশু ধরে নিয়ে যেতে থাকে। ক্ষেতের ফসল ক্রোক করে। তথাপি কিন্তু প্রজারা স্থির প্রতিজ্ঞ। এই আন্দোলন মাস চারেক চলেছিল। তারপর এইসব দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে খেড়ার সত্যাগ্রহীরা জয়ী হল। সরকার মেনে নিলেন যে, যারা সক্ষম তারা খাজনা দেবে এবং গরীবরা রেহাই পাবে।

খেড়া সত্যাগ্রহ পরিচালক স্থানীয় নেতাদের সবাই কিন্তু সর্বাংশে সত্যের পথ অবলম্বন করেননি। শান্তি অবশ্যই রক্ষা করা হয়েছিল, তবে কিষাণদের অহিংস ভাবটা ততটা গভীর ছিল না। অবশ্য একথা খুবই সত্যি যে, ওখানে জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট জাগরণ দেখা দেয়।

মহাত্মাজীর মতে, অহিংস করবন্ধ কেবল কঠোর অনুশীলনের পর আরম্ভ করার মতো কার্যসূচী। যতক্ষণ না পর্যন্ত কিষাণরা অহিংস করবন্ধের যৌক্তিকতা সম্পর্কে উপলব্ধি করার উপযুক্ত শিক্ষা না পাবে এবং তাঁদের জমিজিরাৎ বাজেয়াপ্ত করার এবং গবাদি পশু ও তৈজসপত্র জোরজুলুম করে বেচে দেবার দৃশ্য, শান্ত প্রতিরোধমূলক দৃষ্টিতে দেখতে প্রস্তুত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের করবন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী পবিত্র প্যালেষ্টাইনে যা ঘটেছিল, সে কথা কিষাণদের বলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। আরবদের জরিমানা করে সৈন্য দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। তাদের মাথার ওপরে বিমান বহর গর্জাচ্ছিল। বলবান আরবদের গৃহপালিত পশু কেড়ে নিয়ে নির্জলা উপোস করিয়ে রাখা হয়। অসহায় ও বিমূঢ় আরবরা যখন জরিমানা ও অতিরিক্ত খেসারৎ নিয়ে হাজির হল, তখন তাদের বিদ্রূপ করার জন্যই তাদের মুমূর্ষু ও মৃত পশুগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হল।

গান্ধীজী যথার্থই আশংকা করেছিলেন যে, ভারতে এর থেকেও শোচনীয় ঘটনা ঘটা সম্ভব। তাই ভারতীয় কিষাণ সমাজ যখনই এইরকম অগ্নি পরীক্ষায় স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে শান্তিপূর্ণ ভাবে চলতে শিখবে, তখনই বলতে হবে যে, তারা করবন্ধের জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়েছে এবং গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস, তখনই আমলাদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে আসবে।

এরপরে গুজরাটে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সুযোগ্য নেতৃত্বে ঘটে বারদৌলি সত্যাগ্রহ। সেটাও ছিল কিষাণদের খাজনা দেবার সমস্যা নিয়ে। বারদৌলি হচ্ছে গুজরাটের একটি এলাকা। ওখানকার জনসাধরণ খুবই সুশৃঙ্খল হওয়াতে গান্ধীজী সেখানে ব্যপক গণ আইন অমান্য আন্দোলনের পরীক্ষা নিরীক্ষা কব্বার ব্যবস্থা করেন। তবে দেশের নানান স্থানে হিংসাত্মক

আন্দোলনের সূচনা হওয়ায় ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারীমাসে ঐ পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয়।

কিন্তু ১৯২৮ সালে বারদৌলিতে আবার সুযোগ আসে। তখন ওখানে নিয়মিত সেটেলমেণ্ট হবার কথা ছিল এবং সরকার প্রায় ২৫ শতাংশ কর বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু জনসাধারণ দাবী জানায় যে, কর বাড়াবার আগে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে একটা তদন্ত হওয়া দরকার। তাতে সরকার সম্মত না হওয়ায় করবন্ধের আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত সরকার জনগণের দাবীর কাছে নতিস্বীকার করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ আন্দোলন জনসাধারণের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়।

সংশ্লিষ্ট রায়তেরা যে, অযৌক্তিক ও অন্যায় ভাবে ধার্য কর, না দেবার দাবী করে, তাকে গান্ধীজী বলেছেন, কোন ঘাতক কর্তৃক মহাজনের দাবী করা পাওনার একাংশ দিতে অস্বীকার করার সামিল। ঘাতক যদি মহাজনের দাবীর একাংশ অন্যায় মনে করে তা দিতে না চায়, তবে রায়তও সেরকমভাবে যে খাজনা অন্যায় বিবেচনা করে, তা দিতে অসম্মত হতে পারে।

ঐ সংগ্রাম ছিল প্রধানত বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেই। কিন্তু জমিদারী ব্যবস্থা, জমিদারদের দ্বারা দরিদ্র কিষাণদের শোষণ ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কেও তিনি স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করেছেন। উত্তর প্রদেশ ভ্রমণ কালে কিছু তরুণ জমিদারের সরল জীবনযাত্রা দেখে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের রায়তদের দুঃখদৈন্য লাঘব করতে দেখে গান্ধীজীর যা আনন্দ হয়েছিল, তা আর নাকি কিছুতেই হয়নি।

গান্ধীজী বহু জমিদারের অনেক অত্যাচারের ভয়াবহ কত কাহিনী শুনেছিলেন। কিভাবে তাঁরা নানান সুযোগে বৈধ ও অবৈধভাবে খাজনা আদায় করে রায়তদের একদম কৃষিদাসে পরিণত করতেন, সে সব তিনি জেনেছেন। সেইজন্যই এই রকম কিছু তরুণ তালুকদারদের আবিষ্কার করতে পেরে তিনি এক সুখকর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছেন। তিনি বলছেন: "...দেখে আমার যত আনন্দ হয়েছিল আর কিছুতেই তত হয়নি।...এই

ধরনের কয়েকজন তরুণ তালুকদারদের আবিষ্কার করতে পারা আমার কাছে এক সুখকর বিস্ময় হয়েছে।"

সুতরাং গান্ধীজীর স্পষ্ট অভিমত: "যতক্ষণ জমিদার রায়তদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন ততক্ষণ তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই।" কিন্তু যেহেতু তখনও পর্যন্ত বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হচ্ছিল, সেহেতু তাঁর মতে ঐ পরিবর্তন আরো অগ্রসর ও সম্পূর্ণ হওয়া দরকার।

তাই কোলকাতায় প্রেসকর্মীদের এক সভায় ভূমি ও জমিদারী সমস্যা সম্পর্কে, সমাজবাদীদের সঙ্গে তাঁর ধারণার তফাৎ বোঝাতে গিয়ে গান্ধীজী বলেন যে, জমিদারী প্রথার একেবারে অবসান না ঘটিয়ে, তার সংস্কার সাধন প্রয়োজন। আর সেটা না করা গেলে নিজে থেকেই তা লুপ্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি বুদ্ধি ও অর্থ যোগান দেয় সেও হস্তশ্রম করে এমন চাষীর মতই একজন ব্যক্তি। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, তাদের মধ্যে বর্তমানে যে ভয়ানক অসাম্য আছে তা দূর করা।"

এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর "নোয়াখালির ডাইরি"র পাতা উল্টে দেখি তাতে লেখা রয়েছে: "বর্তমান ব্যবস্থায় জমির মালিক—কৃষিজাত দ্রব্যের অর্ধেক পায়—উহা কমাইয়া তিন ভাগের একভাগ করিবার চেষ্টা হইতেছে। ...আমি এই চেষ্টাকে ভাল বলিয়াই মনে করি। ইহাতে সার আছে। ভূমি তো সমস্তই ভগবানের, সুতরাং যে চাষ করিবে ভূমি তাহারই। কিন্তু সেই আদর্শ অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্বে জমিদারের অংশ কমাইবার এই চেষ্টা ঠিকই হইতেছে।"

অবশ্য যারা এই চেষ্টা করছেন, গান্ধীজী তাদের সাবধান করে দিচ্ছেন যে, এ নিয়ে তারা যেন কোন জোর জবরদস্তি বা হিংসামূলক কোন কিছু না করেন। তাতে তাঁর যোগ থাকবে না। এই সংস্কারের কাজ করতে পারা যাবে শুধু বলিষ্ঠ জনমত গঠনের মাধ্যমেই। সেজন্য সংস্কারকদের ধৈর্য ধরতে তিনি অনুরোধ করেন। তাঁর ধারণা: "লক্ষ্য ভাল হইলেও তাহার সাধনের জন্য যে কোন হিংসাত্মক অথবা অন্যায় উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল বলিয়া অনেক সৎচেষ্টা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

মহাত্মাজীর মতে, অন্যায়কারীকে তার কৃত অপকর্ম সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত করাই হবে প্রথম কাজ। তাদেরকে সংশোধনের জন্য সুযোগ ও সময় দেওয়া অহিংসা নীতির এক মূলকথা। তবে তাই বলে অন্যায়কে মাথা পেতে গ্রহণ করা বা তার কাছে নতি স্বীকার করা কখনই অহিংসা নীতি সমর্থন করবে না।

গান্ধীজী বলেন, জমিদার ও মহাজনেরা আমলাতন্ত্রের ধারক ও বাহক বটে, কিন্তু তাঁরা অসহায়। তাঁদের ঐ সমস্ত ত্রুটি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে দূর করার জন্য ভাল করে বলতে হবে। তাঁদের বোঝাতে হবে যে, তাঁদের মধ্যে যে আত্মা, রায়তদের ভেতরেও সেই একই আত্মা বিরাজমান। তাঁরা যদি তাঁদের মনোভাব পাল্টায়, তবে তাঁদের বুদ্ধি জাতির সেবায় নিয়োজিত করা যেতে পারে।

গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঐসব পুঁজিপতিরা যদি জাপানের "সমুরাই" নামক ঐশ্বর্যশালী মহানুভবদের মতো তাঁদেরও নিজেদের সম্পদের আছি বলে মনে করে সেই সম্পদ তাঁদের অধীন রায়তদের কল্যাণার্থে রক্ষা করে, তবে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কিছুই হারাবেন না, বরং সবকিছুই পাবেন। তাঁদের রায়তদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে হবে, রায়তদের আর্থিক অবস্থার অধ্যয়ন করতে হবে এবং বিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানে রায়তদের ও তাঁদের নিজেদের সন্তানদের একত্রে শিক্ষা দিতে হবে। গ্রামের কুয়ো ও পুকুরগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। প্রয়োজনমত নিজেদেরও পরিশ্রম করে রায়তদের রাস্তা ঝাঁট দিতে ও পায়খানা পরিষ্কার করতে শিক্ষা দিতে হবে।

কিষাণদেরও তাঁদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কথা গান্ধীজী বলেছেন। তিনি ঠিকই বলেছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বিদায় নিতে হবেই। তাঁর মতে, কিষাণদের সমৃদ্ধিশালী ও সুখী করার পথ হচ্ছে, তাঁদের বর্তমান দুরবস্থার কারণ জানা ও তা দূর করার উপায় সম্বন্ধে তাঁদের শিক্ষিত করে তোলা। কোন জমিদার যদি তাঁর আগের চাষীদের ছাঁটাই করে দিয়ে নূতন কিষাণ নিযুক্ত করেন, তবে প্রাক্তন চাষীরা হটে না এসে, শান্তিপূর্ণ ভাবে তাঁদের অধিকার স্থাপনের

উদ্দেশ্যে আন্দোলন চলিয়ে যাবে, যতদিন না পর্যন্ত নবাগত কিষাণ শ্রমিকরা প্রাক্তন চাষীভাইদের দুঃখের কারণের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে।

এইভাবে সত্যের পূজারী মহাত্মা গান্ধী বুঝিয়ে দেন যে, সত্যাগ্রহ হচ্ছে জনমনকে শিক্ষিত করে তোলার পথ এবং ক্রমে তা সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবশেষে দুর্জয় হয়ে ওঠে। আর হিংসার দ্বারা এই প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। হিংসার পথ হল ধ্বংসের পথ।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর "গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি" নামক পুস্তিকাটির "কিষাণ" শীর্ষক অংশে বলেছেন যে, স্বরাজের বিশাল কাঠামো ৮০ কোটি হাতের শ্রমে গড়ে উঠবে এবং এদের মধ্যে কিষাণ অর্থাৎ চাষীরাই হচ্ছে সবচাইতে বেশী সংখ্যক। তাই তাঁরা যখন তাঁদের অহিংস শক্তির বিষয় অবহিত হবেন, তখন পৃথিবীর কোন শক্তিই তাঁদের ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পদাধিকারের জন্য কিষাণদের ব্যবহার করাটা কখনো উচিত নয় বলে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। এটা অহিংস পন্থার বিপরীত বলে তিনি মনে করেন।

কিষাণ সম্পর্কে গান্ধীজীর প্রবর্তিত নীতির পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর চম্পারণ, খেড়া, বারদৌলি প্রভৃতি কিষাণ আন্দোলন পর্যালোচনার মাধ্যমে। সেগুলির সাফল্যের মূলে ছিল, কিষাণদের নিজেদের ব্যক্তিগত ও অনুভূত অন্যায়ের প্রতিকারের উদ্দেশ্য ছাড়া, রাজনৈতিক কারণে নিয়োজিত করা থেকে বিরত থাকা।

বিশেষভাবে কিষাণদের সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে গান্ধীজী তাঁর স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন: "কিষাণদের জন্যও কংগ্রেসের ভিতর একটি বিভাগ থাকা চাই, যাহাতে কিষাণদের বিশেষ সমস্যাগুলি বিবেচিত হইবে।"

মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি তো এই কিষাণরাই। তাই এঁদের অবস্থার উন্নতি করতে তিনি যেমনি একদিকে বলেছেন সমবায়ে চাষবাস, পশুপালন প্রভৃতি করতে, তেমনি তাঁদের বাধ্যতামূলক বেকারত্ব ঘোচাতে জোর দিয়েছেন, সমবায় প্রথায় কৃষিকেন্দ্রিক শিল্প পরিচালনার ওপরও।

আজ আনন্দ-সংবাদ যে, আমাদের সরকারও গ্রামের দিকে ঝুঁকে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প তথা গ্রামীণ অর্থনীতির কথা বিশেষভাবে ভাবছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মতো রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা সরকারের ওপর নির্ভরতার বদলে জনশক্তির উদ্বোধনের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জনগণের মধ্যে এই নবচেতনা সৃষ্টি করাই কঠিন কাজ। অতএব সেইদিকেই আমাদের এখন যথেষ্ট পরিমাণে মনোনিবেশ করা কর্তব্য। আর আজ আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষের এই পুণ্যলগ্নে শান্তির মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর মহান উপদেশাবলী যথাসম্ভব অনুসরণ করেই তা করা উচিত।

॥ চোদ্দ ॥

আদিবাসীদের বুনিয়াদী শিক্ষা ও গান্ধীজী

"There are chords in every human heart. If we only know how to strike the right chord, we bring out the music."

—M. K. Gandhi

"আদিবাসী" কথাটির অর্থ আদিম অধিবাসী। ভীল, গণ্ড বা পাহাড়ী লোক বা অরণ্যের আদিম অধিবাসী বলে বিধৃত লোকদের আদিবাসী বলা হয়। মহাত্মা গান্ধী বুঝেছিলেন যে, আমাদের এই বিশাল দেশে এত বিভিন্ন রকম জাতি বাস করে যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই এখানকার সমস্ত লোকের কথা ও তাদের অবস্থার কথা জানেন না। ঐ সব লোকেরা মন ও আত্মার বিকাশের সব রকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অশিক্ষা ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে, জীবন তাদের কাছে এক পীড়াজনক কুকর্মের বোঝাস্বরূপ এবং কোনরকমে তার ভিতর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তারা চলে। আর আমাদের অতীতের অবহেলায় হয়ে ওঠে রুক্ষ।

গান্ধীজী তাই তাঁর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিতে আদিবাসীদের সেবা করাকেই প্রধান কাজ বলে মনে করেছেন। এর মূলে রয়েছে তাঁর "সর্বোদয়" ভাবনা। এর অর্থ সকলের কল্যাণ। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন তিনি ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্ রাস্কিনের "আনটু দিস্ লাষ্ট" বইটি পড়ে, ঐভাবে ভাবিত হয়ে এই কথাটির সৃষ্টি করেন। 'সর্বোদয়' হবে 'অন্ত্যোদয়'-এর দ্বারা, অর্থাৎ সমাজের দীনতম মানুষটির কল্যাণের মাধ্যমে। সুতরাং সমাজের সব শেষের লোকটির মঙ্গলই মুখ্য চিন্তা এখানে। এতে যেন শুনতে পাই সেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতটির সুর:

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে॥"

অতএব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সর্বোদয় সমাজের রূপ হল সকলকে উৎপাদক শ্রমিকে পরিণত করে প্রগতির পথে পরিচালিত করার প্রয়াস।

আমরা জানি গান্ধীজী তাঁর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিতে শিক্ষাকে দিয়েছেন সবচেয়ে বড় স্থান। মহাত্মাজী মূলতঃ তাঁর সমস্ত প্রয়োগ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন পূর্ণ মানুষের জীবনচর্চার কলা উদ্ভাবনের দৃষ্টিতেই। আর তা থেকেই সূত্রপাত তাঁর নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার। তিনি বুঝেছিলেন যে, বুনিয়াদ শক্ত না হলে উপরিস্তরের কাঠামো যে কোন সময়েই ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাই বুনিয়াদ গড়ার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন বুনিয়াদ শিক্ষার। এটাই তাঁর মতে আদিবাসীদের সেবা করার প্রধান পথ। তাঁর বক্তব্য: "দেশে আমাদের চতুর্দিকে যে পরিবেশ তাকে কেন্দ্র করে এবং তার চাহিদা মেটাতে বুনিয়াদী শিক্ষার জন্ম।"

সুতরাং পরিবেশের চাহিদা মেটানোই হ'ল এর লক্ষ্য। আর এই পরিবেশ দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামে কোটি কোটি অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের ভোলা যায় না। তাহলে ভুলতে হয় গোটা ভারতবর্ষকেই। সেইজন্যই বুনিয়াদী শিক্ষা হ'ল কর্মকেন্দ্রিক। এবং সে কর্ম হচ্ছে এমন কর্ম যা জীবন সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়ে জীবন বিকাশের পথ প্রশস্ত করে। তাই গান্ধীজী শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন: "শিক্ষা হবে জীবনের জন্য এবং জীবনের মাধ্যমে।" রবীন্দ্রনাথের কাছেও আমরা ঐ একই কথা শুনি: "শিক্ষা জিনিসটাতো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কি হইব এবং কি শিখিব, এ দুটি কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।"

মহাত্মা গান্ধী তাঁর নতুন শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন অর্থনীতির ভিত্তিতে অর্থাৎ, শিক্ষা হবে স্বাবলম্বী। ছাত্ররা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করবে, বস্ত্রাদি তৈরী করবে এবং উদ্বৃত্ত জিনিস বিক্রি করবে এবং সেই অর্থ দিয়ে বিদ্যালয়ের বেতন হবে। এইভাবে শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদক কর্ম যুক্ত হওয়ায় জীবনযাপনের পক্ষে সেটা হবে খুব লাভজনক।

গান্ধীজী তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে মনে করেন যে, এতে ভারতের নিরক্ষরতার সমস্যা ও বেকার সমস্যা—দুইই দূর হয়ে আদি-

বাসীদের উন্নতি হবে। অহিংসাই তাঁর স্বাবলম্বনমূলক শিক্ষার ভিত্তি। তাঁর নব শিক্ষা পরিকল্পনায় "অহিংসা"র অর্থ, অন্যকে শোষণ ও পেষণ না করে জীবিকার্জন। এবং সেটাই মানব ধর্ম। রবীন্দ্রনাথও বহু জায়গায় এই মানব ধর্মের কথা বলেছেন।

সর্বোপরি সমাজ থেকে শোষণের মূলোচ্ছেদের জন্য স্বাবলম্বী জীবন গঠন অপরিহার্য। তাই গান্ধীজী ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে স্বাবলম্বনের বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন বলে শিক্ষা ব্যবস্থায় সেটা প্রবর্তন করে স্পষ্টই বলেছেন: "পূর্ণভাবে গ্রহণ করলে এই শিক্ষা স্বাবলম্বী হতে পারে ও নিশ্চয়ই হবে; প্রকৃতপক্ষে, সাবলম্বনের সাফল্যই হবে এই শিক্ষার চরমপরীক্ষা স্বরূপ ." তাঁর মতে ৭ থেকে ১৪ বছর বয়স অবধি সব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুরু থেকেই স্বাবলম্বী হবার জন্য তাদের চেষ্টা থাকবে।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষাসত্র" উল্লেখযোগ্য। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা স্বাবলম্বী হবে, এ পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের ছিল। তবে বিদ্যালয়ের ব্যয় তাদের উপার্জিত অর্থে চলবে, সেকথা তিনি কখনো ভাবেন নি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর "শিক্ষাসত্র" সম্বন্ধে মনে করতেন যে, ছাত্রছাত্রীরা ৬ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষাসত্রে থেকে যে সমস্ত কারুশিল্প শিখবে, সেগুলিরই অনুশীলনে তাদের জীবিকা না হোক, উপজীবিকা হিসেবে কিছু অর্থাগম হতে পারে।

গান্ধীজীর বিশ্বাস, কর্ম ও কারুকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মনোবিকাশও ঘটে। এতে বুদ্ধি, শরীর ও আত্মার বিকাশের পূর্ণ অবকাশ থাকবে। এবং এদের সমবায়ে মানুষ স্বাভাবিক ও একটি পরিপূর্ণ সত্তায় পরিণত হবে। তাঁর স্পষ্ট কথা: "আমি বিশ্বাস করি যে, একমাত্র হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথোচিত অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের দ্বারাই বুদ্ধির যথার্থ শিক্ষণ সম্ভবপর।"

মহাত্মাজীর মতে, প্রত্যেক ছাত্রাবাসে ময়লা সাফ করা সহ যাবতীয় শ্রমমূলক কাজ ছাত্রাবাসের অধিবাসীদের দিয়েই করানো দরকার। এতে

লেখাপড়ার সঙ্গে বাস্তবতা বোধ যুক্ত হবে। ছাত্রাবাসের পরিচালকেরা নিজেরা এসব কাজে অংশ নিয়ে স্বয়ং আদর্শ স্থাপন করলে ছাত্রদের মনে হীনমন্যতা জন্মাবে না।

মহাত্মা গান্ধী সমগ্র বিদ্যালয়কে শুধুমাত্র বইপড়ার জায়গার বদলে এক কর্মমুখর সমাজ জীবনে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর "নয়ী তালিম" বিদ্যালয়গুলিতে এই রকম এক সামূহিক জীবন সৃষ্টি করার কথা বলেছেন। পরিবেশের বিভিন্ন অভাব, কুসংস্কার, কুপ্রথা প্রভৃতি দূর করে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করাই হ'ল নয়ী তালিম কর্মীর মুখ্য উদ্দেশ্য। গান্ধীজী বলেন: "শুধু লিখতে পড়তে শেখাকেই আমি কখনও চরম মোক্ষ জ্ঞান করি নি। আমার অভিজ্ঞতার ফলে আমি সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যে, শুধু স্বাক্ষরতা মানবের নৈতিক স্তরকে তিলমাত্র উন্নত করে না এবং চরিত্র-গঠন এক পৃথক বস্তু।" সুতরাং আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই কেবল যথার্থ শিক্ষার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় গান্ধীজী তাঁর আশ্রমে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা করেন। সেখানে "টলষ্টয় ফার্ম" স্থাপন করে কালেনবাকের কাছে তিনি স্বয়ং কাঠের ও জুতো তৈরীর কাজ শেখেন এবং আশ্রম শিশুদের মধ্যে ঐরকম শিল্প-মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। তাঁর ছাত্রেরা শারীরিক কঠিন শ্রমে অভ্যস্ত হত। নিজেরা নিজেদের সব কাজ করত। এমনকি কাপড় বুনত, জুতো তৈরী করত। ভারতে ফেরার পরেও তিনি নানাভাবে আদিবাসীদের মধ্যেও এর প্রয়োগ করেছেন। শেষে ১৯৩৭ সালের ২২ ও ২৩শে অক্টোবর ওয়ার্ধা শহরে মারোয়ারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর নেতৃত্বে অখিল ভারত জাতীয় শিক্ষার যে এক সম্মেলন হয়, সেখানে তিনি তাঁর এই নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার রূপরেখা পেশ করেন।

সেই সময় ওয়ার্ধায় মারোয়ারী বিদ্যালয়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন আর্যনায়কম। আর তাঁর স্ত্রী আশাদেবী ছিলেন মহিলাশ্রমের সর্বেসর্বা। এঁরা দুজনেই আগে অনেকদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ঐ সময় তাঁরা

শ্লয়ড শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রেও যোগ দিয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ও এলম্‌হার্টের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাবিধি সম্পর্কে এঁরা ওয়াকিবহাল ছিলেন।

ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, তাতে জাকির হোসেন সভাপতি এবং আর্যনায়কম্‌ আহ্বায়ক হন। আর্যনায়কমের শান্তিনিকেতনের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায়, তাঁর পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম খসড়া রচনা করা সহজ হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষভাবে স্থান পায় শিল্পচর্চা। এতে শিক্ষা-শিল্পের আদর্শ আমাদের দেশে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে।

ঐ শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস কমিটির অধিবেশন বসেছিল ওয়ার্ধা শহরের "বাজাজবাড়ী" ও "নব ভারত বিদ্যালয়"-এ। ঐ অধিবেশনে জে, সি, কুমারাপ্পা, মাসরুয়ালা, আচার্য বিনোবা ভাবে প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি যোগ দিয়েছিলেন।

শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য, শিক্ষার আধার হিসাবে কর্ম-বিজ্ঞান ও শিল্প বিজ্ঞানকে দেশের জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ রূপে বাস্তবায়িত করতে হলে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর এই শিক্ষা পরিকল্পনার ব্যাপারে সহযোগিতা করা যে দরকার, সেকথা তখন বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করা হয়েছিল।

এইভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার খসড়া প্রস্তুত হয় রবীন্দ্রনাথ ও এলম্‌হার্স্ট প্রবর্তিত "শিক্ষাসত্র"র পাঠক্রম ও পদ্ধতি এবং গান্ধীজীর কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনার সমন্বয়ে। এই পাঠক্রম রচনায় জাকির হোসেন কমিটির সদস্যরা কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেন। তাঁদের মধ্যে বিশ্বভারতীর লক্ষ্মীশ্বর সিংহ কার্ডবোর্ড, কাঠের কাজ ও ধাতুশিল্প শিক্ষার পাঠক্রম প্রস্তুত করেছেন। নন্দলাল বসু ড্রইং বা চিত্রবিদ্যার পাঠক্রম লিখেছেন। এইসব করে পল্লীগ্রামের আদিবাসী তথা সমগ্র ভারতবাসীর কল্যাণের পথ প্রশস্ত হয়।

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষারূপে গ্রহণ করা হয় এবং ওয়ার্ধা থেকে পাঠক্রম প্রকাশিত হয়। ঐ বছরেই এপ্রিল

মাসে "বিদ্যামন্দির" নামে ওয়ার্ধায় এক বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের খ্যাতিমান সব শিক্ষাবিদ এই জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্বোধনে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঐ সময়ই আবার গান্ধীজীর নির্দেশে সর্বভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারের আয়াসে সেবা গ্রামে হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

যাইহোক, ১৯৪০ সালে দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইঙ্গিত ছিল বলে মহাত্মা গান্ধী শিল্প-বিশারদদের "বিদ্যামন্দির" পরিত্যাগের পরামর্শ দেন। তিনি তখন সরকারী সাহায্য ছাড়াই সেবাগ্রামে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করেন।

এই সময়ে পল্লী অঞ্চলের কৃষি ও শিল্প জীবনের সর্বাঙ্গীন শিক্ষা পদ্ধতি সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে গড়ে তোলার কথা চিন্তা করা হচ্ছিল। দেশীয় পল্লীর আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনাকে রূপদানের বাসনা বেড়ে উঠেছিল। পল্লী-প্রধান অঞ্চলে যেখানে হিন্দু-মুসলমান ও বিভিন্ন জাতির বাস এবং যেখানে উর্বর জমি আছে ও জলের প্রাচুর্য পাওয়া যায় সেখানে কৃষি ও শিল্পের সমন্বয়ে স্বাবলম্বী প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলাই ছিল আসল লক্ষ্য।

আমরা জানি ১৯৪১ সালের শেষভাগে মহাত্মাজী সেবাগ্রামে "নয়ী তালিম ভবন" নামে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। অবশ্য ১৯২১ সালের দেশজোড়া অসহযোগ আন্দোলনের সময় "জাতীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়"-এ চরকা চালিয়ে সুতো তৈরী এবং তাঁত শিক্ষার চেষ্টা হয়। ১৯৪২ সালের শুরুতে সেবাগ্রামে "নয়ী তালিম ভবন"-এর উদ্যোগ উঠেছিল। সেই সময় সেবাগ্রামে সর্বভারতীয় কাট্নী সঙ্ঘ, গোশালা ও নয়ী তালিম ভবনের হোস্টেল, অধ্যাপকদের বাসস্থান প্রভৃতি প্রস্তুত হচ্ছিল।

মহাত্মা গান্ধী কামারের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং কর্মশালাও করেন। প্রথমে স্থানীয় কামারদের দিয়ে কর্মশালা নির্মাণের

কব্জা, কড়া, দরজার হাতল, খিল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস তৈরী করতেন। সেবাগ্রামের ঘর-বাড়ীর বিশেষ দরকারী দরজা, জানালা, শেলফ্, আলমারী, ডেস্ক ইত্যাদি সামগ্রীও সেবাগ্রামের কর্মশালায় করা হত। ঐ সময়ই একটা বিশেষ রকমের গরুর গাড়ীর নকসা করে গাড়ীও তৈরী করা হয়।

আমরা দেখেছি, গান্ধাজী জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই রকমভাবে প্রস্তুত পাঠক্রমের কথাই বার বার বলেছেন। এর ভিতর জীবন-ভিত্তিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত হয়, যেমন সমাজ সেবা, শিল্প, হাতের কাজ প্রভৃতি। সুতরাং সমাজবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শরীরচর্চা, শিল্পকলা, হস্তশিল্প, মাতৃভাষা প্রভৃতির প্রাধান্য পাওয়া যায় তাঁর প্রবর্তিত পাঠক্রমের মধ্যে।

গান্ধীজীর মতে, অনুবদ্ধ প্রণালীর মাধ্যমে যদি কোন একটা হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে পুরো পাঠ্য বিষয় শেখানো হয়, তাহলে তা সার্থক হবে। এরূপ শিক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে ডিউইর শিক্ষাতত্ত্ব এবং প্রোজেক্ট পদ্ধতির প্রচুর সাদৃশ্য আছে। গান্ধীজীর শিক্ষণ-পদ্ধতির পুরো পরিকল্পনাই তা সমাজ-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের বিশেষ তত্ত্বের ভিত্তিতে। অবশ্য যে জীবন দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর গোটা শিক্ষা নীতি, তাকে যতক্ষণ না বাস্তবায়িত করা যাবে, ততক্ষণ শুধু শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগ করে গেলেই সত্যিকারের সার্থকতা সম্ভব নয়।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, চতুর্দিকে দৃষ্টি রেখে গান্ধীজী যে সুসমঞ্জস পাঠ্যসূচী প্রবর্তনে প্রয়াস পেয়েছিলেন, আজকের দিনেও তার মূল্য কতখানি। অবশ্য অনেক সময় মনে হতে পারে যে, তাঁর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার উপযোগিতা আধুনিক যুগে অনেকটা সীমিত, তথাপি অর্থনৈতিক ও বাস্তব বুদ্ধিতে বিচার করে দেখা যায় যে, তার মূল্য নেহাত কম নয়। আর সত্যই সুখের কথা যে, বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদক কর্মের নীতি আজ পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষাবিদের দ্বারাই শুধু যে স্বীকৃত হয়েছে তাই নয়, বরং বিভিন্ন দেশে এর প্রচলনও শুরু হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে কেবল শিক্ষকতা ও কেরানী-গিরিই শিক্ষিতের জন্য না রেখে, নানাদিকে হাতের কাজের জ্ঞান ও অভ্যাস গড়ে উঠলে জীবিকার্জনের সমস্যার সমাধান হবে। আর ঠিকমতো চলতে পারলে অচিরেই মহাত্মা গান্ধীর গ্রামোদ্যোগ ও "নয়ী তালিম"-এর পথ বেয়ে প্রতিটি গ্রাম শুধু বস্ত্রেই স্বাবলম্বী হবে না, জীবন ধারণোপযোগী অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্রেও স্বাবলম্বী হবে। এতে আসবে হতাশার বদলে আশা, দৈন্যের স্থলে স্বচ্ছলতা, বেকারত্বের পরিবর্তে শিল্প ও কর্মের চাঞ্চল্য এবং অনৈক্যের স্থলে ঐক্য।

॥ পনর ॥

গ্রামীণ-শিল্প বিকাশে গান্ধীজী

"I have no doubt in my mind that we add to the national wealth if we help the small-scale industries."

—M. K. Gandhi

মহাত্মা গান্ধী বেশ ভালভাবেই বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষের মর্মকেন্দ্রই গ্রাম। ভারতবর্ষ গ্রামেই বাস করে। গ্রামীণ সভ্যতাই ভারতীয় সভ্যতা। গ্রামই ভারতের প্রাণ স্বরূপ। তাই ভারতের গ্রামকে বাঁচাতে না পারলে ভারতবর্ষকেও বাঁচানো যাবে না। তিনি স্পষ্টই বলেছেন: "যদি গ্রামগুলি ধ্বংস হয় তবে ভারতবর্ষও ধ্বংস হবে।" ভারতীয় অর্থনীতি প্রধানতঃ গ্রামীণ অর্থনীতি। সেজন্য গ্রামীণ অর্থনীতি দৃঢ় না হলে ভারতীয় অর্থনীতিও ভেঙ্গে পড়বে। অতএব গ্রাম-ভারতের অর্থ নৈতিক মুক্তি সাধন করতে পারলেই ভারত সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হবে।

গান্ধীজী জানতেন যে, মৃতপ্রায় গ্রামের পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়েই বাঁচবে গোটা ভারতবর্ষ, কেননা এদেশের আপামর জনগণের অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা কেবলমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তাই তিনি আমাদের গ্রামগুলিকে এমন ভাবে সংগঠিত করতে চেয়েছেন যাতে কৃষি ও গ্রামীণ শিল্প বিকাশের মাধ্যমে সেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। তিনি আশা করেছেন যে, গ্রামবাসীরা এমন উঁচুদরের কারিগর হবে যে, তাদের তৈরী সব জিনিস নিমেষে বাজারে বিক্রি হয়ে যাবে। গ্রামগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ হলে তখন সেখানে তার সুদক্ষ কারিগর ও উঁচু শিল্প প্রতিভা সম্পন্ন অধিবাসীর অভাব থকেবে না।

গান্ধীজীর মতে গ্রামগুলির পুনরুজ্জীবন তখনই সম্ভবপর, যেদিন তারা আর শোষিত হবে না। ব্যাপকভাবে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন করা মানে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে গ্রামগুলি শোষিত হবে, কারণ এতে প্রতিযোগিতা ও বাজারের সমস্যা সৃষ্ট হবে। অতএব তাঁর বক্তব্য: "গ্রামেতেই

আমাদের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে, যাতে গ্রামগুলি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে এবং প্রধানতঃ আপন প্রয়োজনীয় বস্তুরই উৎপাদন করে।"

মহাত্মাজী যতই ব্যাপক ভাবে গ্রামে গেছেন, ততই গ্রামবাসীদের হতাশাপূর্ণ শূন্য দৃষ্টি তাঁর বুকে বড় বেদনার মত বেজেছে। তাই কৃষির মাধ্যমে যথেষ্ট আয় না হবার দারুণ এবং অনেক সময় বেকার থাকার জন্য যে সব গ্রামবাসী নিত্য অভাব পীড়িত, তাদের রক্ষার্থে তিনি গ্রামীণ-শিল্প বিকাশের ওপর, বিশেষতঃ সুতো কাটা প্রবর্তন করার ওপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। অবশ্য দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতার কথা বিচার না করেই প্রত্যেক গ্রামেই সকলের নিজের প্রয়োজনের জন্য সুতো কাটার প্রচলন করার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

গান্ধীজীর মতে, সুতোকাটার অনুরূপ দ্বিতীয় কোন শিল্পই নেই বা হতেও পারে না। এর জন্য বিশাল বুদ্ধি, সঞ্চয় বা পুঁজির দরকার নেই। বরং সহজেই এবং সস্তায় তৈরী করা যায়, এবং এ কাজ সহজে শেখাও যায়। আর সহজেই এর দ্বারা উপার্জন করা যায়। তাই তাঁর উপদেশ : "যে সকল অনশনক্লিষ্ট পুরুষ অথবা নারী যে কোন কাজের অভাবে অলস, তাদের আমি জীবিকার জন্য সুতো কাটতে বলেছি এবং অর্ধ অনশনে যে সব কৃষক রয়েছে, তাদের বলেছি অবসর সময়ে সুতো কেটে পরিপূরক উপার্জনের ব্যবস্থা করতে।"

গান্ধীজী দেখিয়েছেন যে, চরখা ক্ষেতের কাজের পরিপূরক ছিল এবং বিধবাদের বন্ধু ও অবলম্বন ছিল। আর তা গ্রামগুলিকে অলসতা থেকে বাঁচাতে, কেননা এর দ্বারা চরখার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বহু শিল্প চলত। গ্রামের কামার, ছুতোর সবাই কাজ পেত। চরখার সঙ্গে তেল ঘানি ইত্যাদি অন্যান্য উদ্যোগও নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব তাঁর বক্তব্য : "গ্রামবাসীর অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে স্বাভাবিক ভাবে যা মনে আসে, তা হচ্ছে চরকা ও তার আনুষঙ্গিক সমস্ত জিনিসের পুনরুজ্জীবন চাই।"

ঘানিতে তেল করা, চামড়া পাকা করা, আসন তৈরী, দেশলাই তৈরী, জাঁতা পেষাই, ঢেঁকি ছাটাই, প্রভৃতি অত্যাবশ্যক গ্রামীণ শিল্প বাদ দিলে

গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাঁর মতে খাদি ছাড়া এগুলি টিকতে পারে না। আবার এসব শিল্প ছাড়া খাদিরও মর্যাদা থাকে না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনে হয়েছে যে, চরখার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্পেরও পুনরুদ্ধার চাই। গান্ধীজী দুঃখ করে বলেছেনঃ "যখন থেকে গ্রামের এই মূল শিল্পটি ও অনুষঙ্গিক শিল্পগুলি অবলীলায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, তখন থেকেই আমাদের গ্রাম থেকে বুদ্ধি ও উজ্জ্বলতা উধাও হয়েছে। গ্রামগুলিকে অন্তঃসারশূন্য, জ্যোতিহীন করে গ্রাম্য অযত্নরক্ষিত পশুদের মত অবস্থাতেই এনে ফেলেছে।"

অতএব এই অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য গান্ধীজীর পরামর্শঃ "গ্রাম নিরীক্ষা করতে হবে এবং ঘানির তেল, খৈল, ঘানিতে তৈরী জ্বালানী তেল, ঢেঁকি ছাটা চাল, তালগুড়, মধু, খেলনা, মাতুর, হাতে তৈরী কাগজ, গ্রামে তৈরী সাবান প্রভৃতি শিল্পজাত জিনিসের কোন কোনটি গ্রামের প্রয়োজন বা বাইরে বিক্রির জন্য অল্প বা বিনা সাহায্যে উৎপন্ন করা যেতে পারে, তার তালিকা করতে হবে।" তাঁর বিশ্বাস, যদি এভাবে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়, তবে যে সব গ্রাম মৃত বা মুমূর্ষু তাদের অধিকাংশই জীবনের গুঞ্জনে ভরে উঠবে। নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে ভারতের অন্যান্য শহর এবং নগরে পাঠাতে পারার মতো কী অগাধ সম্ভাবনা যে তাদের আছে, তাও প্রদর্শন করতে পারবে। নিজহাতে পরিশ্রম করে বুদ্ধিকে তেজদ্দীপ্তকরতে হয় এবং এর থেকেই উদ্ভব হয় বুনিয়াদী শিক্ষার। আর চরখার সাধনা করতে করতে গ্রামোদ্যোগ, নয়ীতালিম ইত্যাদি অন্যান্য জিনিসের জন্ম হয়েছে। তাই তাঁর ধারনা, বুদ্ধিপূর্বক চরখা গ্রহণ করতে পারলে গ্রামগুলির পুনরুজীবন হবে।

অবশ্য মহাত্মাজী বুঝেছিলেন যে, একাজে সাফল্য অর্জনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হল বিশ্বাসের অভাব। এছাড়া বড় অসুবিধা হল মিলের সুন্দর কাপড়ের বদলে খাদি কেনার রুচি মানুষের নেই। মধ্যবর্তীকালীন সময়ে খাদির মহার্ঘতাও একটা সমস্যা। যদি খাদির অনুকূলে বেশী সংখ্যক মানুষের মত থাকে, তবে একে মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতার যোগ্য

করা যেতে পারে। তাই তিনি নিঃসন্দেহ যে, এই আন্দোলনকে সফল করতে হলে কিন্তু লোককে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

গান্ধীজী মনে করেন যে, গ্রামবাসীদের প্রতি এক ভীষণ অবিচার করার অপরাধে আমরা অপরাধী। আর সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা যেতে পারে গ্রামের লুপ্ত শিল্প ও চারুকলা পুনঃপ্রবর্তনে উৎসাহিত করে এবং তৈরী জিনিসের কাটতি সম্পর্কে তাদের নিশ্চয়তা দিয়ে। গ্রামবাসীদের প্রতি আমাদের কর্তব্যে অবহেলা করলে আমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনব। সেই কথা স্মরণ রেখেই আমাদের কাজে অগ্রসর হতে হবে। আর এ কাজ খুব শক্ত নয়। শুধু একটু গ্রামীণ মনোভাবাপন্ন হতে হবে এবং ব্যক্তিগত বা ঘরকন্নার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে এই গ্রামীণ মনোভাব দ্বারা চালিত হতে হবে। এতে খুব একটা খরচের ব্যাপার নেই। চাই কিছু স্বেচ্ছাসেবক, যারা কাছাকাছি গ্রামগুলিতে গিয়ে সেখানকার কারিগরদের আশ্বাস দেবেন যে, তাদের উৎপাদিত সবকিছু অবিলম্বেই নিকটস্থ শহর বা নগরে বিক্রি হবে। তাঁর মতে, সরকারও প্রয়োজনমতো শিল্পে অভিজ্ঞ উপদেষ্টা দেবে এবং গ্রামের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন খাদি কিনতে প্রস্তুত থাকবে।

গান্ধীজীর বিশ্বাস, এক গজ খাদি কেনার মানে, কমপক্ষে এর শতকরা ৮৫ ভাগ ভারতের ক্ষুধার্ত গরীব মানুষের পেটে যাবে। গান্ধীজী বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন ঃ "একথা নিঃসন্দেহ যে, চাহিদা থাকলে গ্রাম থেকেই আমাদের প্রয়োজনের প্রায় সবটা সরবরাহ করা যেতে পারে। গ্রামভাবাপন্ন হলে আমরা পশ্চাত্যের বা কলে তৈরী জিনিসের অনুকরণ চাইব না। সত্যিকারের জাতীয় রুচি আমরা গড়ে তুলব। নূতন ভারতের কল্পনার সঙ্গে তা হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দারিদ্র্য, অনাহার ও আলস্য ভারতে থাকবে না।"

মহাত্মা গান্ধী বুঝেছেন যে, কৃষক ও শ্রমিকের প্রতি অমার্জনীয় অবহেলা আমাদের নিঃস্ব, বুদ্ধিহীন ও স্বভাবজ অলসে পরিণত করেছে। অথচ অতি চমৎকার জলবায়ু, মহীয়ান পর্বতমালা, বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রতীর, গভীর

বনরাজি, বিপুল শ্রমশক্তি, অজস্র নদীনালা নিয়ে ভারতবর্ষ অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী। গ্রামে গ্রামে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হলে দারিদ্র্য ও ব্যাধি দূর হয়।

গান্ধীজী কম্পোস্ট সার তৈরী করার মতো একটা গ্রামীণ শিল্পের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে, গ্রামবাসীরা যদি এ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য তথা সমগ্র ভারতকে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য সহযোগিতা না করেন, তবে অন্যান্য শ্রমশিল্পের মতো এতেও কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যাবে না। তাঁর কথা মতো রোজ ফেলে দেওয়া বাজে জিনিস বিবেচনার সঙ্গে কম্পোস্টে পরিণত করলে জমির মূল্যবান সার হয়, কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হয় এবং খাদ্যশস্য ও ডাল প্রভৃতি উৎপন্নের পরিমাণ বহুগুণ বাড়ে। উপরন্তু আবর্জনার মতো বাজে জিনিসের সদ্ব্যবহারের ফলে চতুর্দিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

তাহলে আমরা দেখলাম যে, গ্রামীণ-শিল্প বিকাশে গান্ধীজীর যুক্তি হল, কর্মহীনের কাজ জোটানো, উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির ব্যবহার, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সংস্থান, বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা, কাঁচামালের সুষ্ঠু ব্যবহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আয় বণ্টনে অসাম্য দূরীকরণ প্রভৃতি। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে, ভারতবর্ষের মতো দেশে যন্ত্রশিল্প ও গ্রামীণ-শিল্প পরস্পর বিকল্প নয়, বরং পরিপূরক। এই বিশাল দেশের উৎপাদন শক্তিকে তিনি বিকেন্দ্রিত করতে চেয়েছেন। চেয়েছেন গাঁয়ের কুটিরে কুটিরে উৎপাদন কেন্দ্র বসিয়ে দিতে। বলেছেন যে, আমাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস আমরা সমবায় প্রয়াসের মাধ্যমে উৎপাদন করব এবং এই সমবায় সৃষ্টি করবে সমগ্র গ্রামজীবনে সুন্দর সমন্বয়। সেই সুর শুনি তাঁর ভাষায়ঃ "There will be some sewing work in the village, smithy, carpentry, leather work, agriculture etc. The village worker should seek to bring about co-operation among the workers in the varions occupations so as to make them serve as harmonious parts of one whole."

মহাত্মা গান্ধী মনে করেন, সমবায় বিকেন্দ্রীকরণে সাহায্য করবে। গ্রামীণ-শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ হল, গ্রামের লোকেরা দ্রব্যাদি তাদের নিজেদের কুটিরে উৎপাদন করলেও, সেগুলিকে কিন্তু একত্র করে বিক্রি করা উচিত এবং লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিলে ভাল হয়।

বড়ই আনন্দের কথা যে, সরকার পঞ্চায়েতী রাজের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন এবং স্বাধীনতার পর অখিল ভারত খাদি গ্রামোদ্যোগ বোর্ড ও কমিশন এবং প্রাদেশিক খাদি গ্রামোদ্যোগ বোর্ডগুলির মাধ্যমে এ কজের জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করেছেন এবং তাদের আওতাভুক্ত বহু গ্রামীণ শিল্পে লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। তথাপি দেখা যায় যে, খাদি গ্রামোদ্যোগের যেন সম্যক বিকাশ হচ্ছে না। গ্রামের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পুনর্জাগরণের সঙ্গে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পকে সংযুক্ত করতে না পারলে এবং ঐ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর উৎপাদন ও উপভোগকে সংগঠিত করতে না পারলে এবং অনুকূল জনমত গঠন করতে সক্ষম না হলে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং ভারতীয় অর্থনীতিরও চরম দুর্গতি।

গান্ধীজী ও সমবায় প্রথা

"The secret of successful co-operation effort is that the members must be honest and know the great merit of co-operation and it must have a definite progressive goal."

—M. K. Gandhi

যে প্রথায় কয়েকজন সম মনোভাবাপন্ন মানুষ নিজেদের ইচ্ছায়, সাম্যের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক তথা সার্বিক উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয় তাকেই বলা হয় সমবায় প্রথা। এর মূল কথাই হ'ল - —কবি কামিনী রায়ের ভাষায় ঃ

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

মহাত্মা গান্ধী এই সমবায় প্রথার প্রয়োজনীয়তার কথাই বলেছেন। এর ওপর তিনি অত্যন্ত জোর দিয়েছেন।

এই সমবায়ের সাফল্যের জন্য চরিত্র গঠনের গুরুত্ব গান্ধীজী বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের কথা বলেন ঃ **"Sir Daniel then shows that it was possible to build up the marvellous Scottish banking system only on the character so built. So far these can be perfect agreement with sir Daniel, for that 'without character there is no co-operation' is a sound maxim."**

গান্ধীজীর মতে, যতদূর সম্ভব প্রায় প্রত্যেক কাজই, এই সমবায় প্রথায় পরিচালিত হওয়া উচিত। তাই সামাজিক মানুষের কর্তব্যই হল সমবায়ে বাস করা এবং সাধারণের স্বার্থে কাজ করা। সর্বোপরি, সংযত অহিংস নীতিই হবে এই সমবায়-প্রথার মূল ভিত্তি।

প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর মূল জীবন নীতিই অহিংসা। এর ওপর ভিত্তি করেই তাঁর সমবায় প্রথার প্রতিষ্ঠা। সমবায় মানেই পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা এবং মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস।

সেই বিশ্বাসের ফলে মানুষের প্রতি বিদ্বেষ, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিলীন হয়ে যায়। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও ঐক্যের শক্তি দৃঢ় হলেই সমবায় কার্যকরী রূপ পায়।

গান্ধীজী স্পষ্টই বলেছেন যে, সত্য ও অহিংসনীতিকে গ্রহণ করলে কোন মানুষই সমাজের বোঝা হয়ে উঠবে না। মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা সমাজের একরকম সেবা। সকলেই যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তবে কেউই সমাজের বোঝা হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা সেই স্তরে পৌঁছাচ্ছি ততক্ষণ সামাজিক জীব হিসাবে সমাজের শৃঙ্খলার জন্য আমরা একে অপরের সেবা করি। তখনই এই পরস্পর নির্ভরতা সত্যিকারের সমবায় হয়ে ওঠে।
সমবায়ে একটা মাধুর্য আছে। এখানে গড়ে ওঠে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক। সমবায়ীদের মধ্যে একটি পরিবারের সদস্যদের মনোভাব কাজ করে। এখানে কোন দুর্বল বা বলশালী নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সমান।

গান্ধীজীর মতে কৃষকদের জন্য সমবায়-প্রথা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। কৃষিক্ষেত্রে সমবায়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন যে, যদি জমি, মূলধন, যন্ত্রপাতি, গবাদি পশু, বীজ, সার ইত্যাদির মালিকানা, একত্র করে, সমবায়ে কাজকর্ম করা যায়, তবে শ্রম, মূলধন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সাশ্রয় হয়। তাঁর ভাষায়ঃ **"My notion of co-operation is that the land would be held in co-operation by the owners and tilled and cultivated also in co-operation. This would cause a saving of labour, capital, tools etc."**

গান্ধীজী মনে করতেন, সমবায় প্রথায় চাষ, জমির চেহারাই পাল্টে দিয়ে,দারিদ্র্য ও আলস্যকে অপসারিত করবে। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বিশ্বাস করতেন যে, সমবায় প্রথায় চাষ না করলে কৃষি থেকে পূর্ণ ফল ভোগ করা যায় না। জমি থেকে সর্বোচ্চ প্রতিদান পাওয়া যায়, এই সমবায় চাষেই। তিনি পরিষ্কার প্রশ্ন তুলেছেনঃ "জমিকে ১০০ ভাগে কে রকমে ভাগ করার থেকে, এটা কি অনেক ভাল নয় যে, একটা

গ্রামের ১০০টি পরিবার, একত্রে তাঁদের জমিজমা চাষাবাদ করে, তার থেকে যা আয় হবে, তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে?" তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য যে, জমিকে টুকেরা টুকরো করা চলবে না। তার বদলে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে, সমরায় প্রথায় জমি চাষ করার জন্য।

এমনিভাবে কৃষকদের মধ্যে সমবায়-প্রথা প্রবর্তিত হলে গান্ধীজী মনে করেন, গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন সমবায় সংস্থা সংগঠিত হতে পারবে। আর সেগুলি নানাভাবে সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতিকে সাহায্য করবে। সমবায় সমিতিগুলি বহুবিধ উপায়ে গ্রাম ও মানুষকে সাহায্য করবে। প্রথমতঃ, শিল্পের জন্য কাঁচামাল মজুত রাখতে পারবে এবং গ্রামের মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য মজুত রাখতে সমর্থ হবে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামের উৎপাদিত ফসলকে বাজারজাত করার ব্যাপারে অনেক সুবিধা হবে এবং মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলিকে সমান ভাবে বণ্টন করা সম্ভব হবে। তৃতীয়তঃ যন্ত্রপাতি, বীজ, খোল, জৈব সার, রাসায়নিক সার—সব কিছুর সমবণ্টনে সফল হওয়া যাবে। চতুর্থতঃ, এক জায়গায় ষাঁড় রাখার ব্যবস্থা হতে পারবে। পঞ্চমতঃ, সমবায় সংস্থাগুলি সাধারণ মানুষ ও সরকারের মাঝখানে অবস্থান করে কর আদায় ও সরকারকে কর প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

গান্ধীজীর মতে, কৃষিক্ষেত্রে যে সমবায় প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই; কিন্তু চরখা চালানোর ক্ষেত্রে, আরো অধিক সৎ সমবায় প্রচেষ্টার প্রয়োজন। চাষ ও চরখার সমবায়ের তুলনায় তিনি গ্রামের উদাহরণ দিয়েছেন। বেশী গম উৎপাদনে, তাঁর মতে, মানুষের সততার থেকে, প্রকৃতির সততাই বেশী দরকার। কিন্তু আমাদের কুটির শিল্পে, সূতো তৈরী একান্ত ভাবে নির্ভর করে, ব্যক্তি মানুষের সততার ওপর। বহু মানুষের ইচ্ছাকৃত ও বুদ্ধি দীপ্ত সমবায় ছাড়া, চরখা চালানো অসম্ভব। এই চরখার ক্ষেত্রে সমবায় দিয়েই, তিনি সমগ্র সমবায় প্রচেষ্টার আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

মহাত্মাজী মনে করেন যে, আদর্শ সমবায়ে কোটি কোটি লোক সংগঠিত

হয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হয়। আর লক্ষ লক্ষ লোক, কর্মনিযুক্ত হয় এবং প্রতিটি পয়সার, হিসাব রাখতে শেখে। তিনি বলেন : "এই প্রকারে চরখার দ্বারা আমরা নিজেদের মধ্যে এই সকল ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পেতে পারি,...গ্রামে গ্রামে স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়ায় থাকতে শিখব, আমাদের পথের সকল বাধা বিপত্তি দূর করতে চেষ্টা করব ইত্যাদি।" তাই ১৯২৫ সালে, মাদ্রাজে এক সমবায় সমিতিতে বক্তৃতা দেবার সময় তিনি বলেছিলেন : চরখার দ্বারা আমি পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সমবায় সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করছি।" তাঁর মতে, সমবায় শুরু থেকেই হওয়া দরকার। তাঁর কাছে চরখার কেন্দ্র একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। যাঁরা তুলোর বীজ ছাড়ায়, তুলো পেঁজে, তুলো ধোনে, সুতো কাটে, কাপড় বোনে এবং কাপড় কেনে, সকলেই এর সদস্য। এঁরা সকলেই পরস্পর সদ্ভাব ও সেবার বাঁধনে বাঁধা।

গান্ধীজী কৃষি, সুতো বোনা, বস্ত্র উৎপাদন প্রভৃতির সঙ্গে সমবায়-প্রথায়, গৃহপালিত পশু পালন করার কথাও বলেছেন। সমবায়-প্রথায় গৃহপালিত পশু পালিত হলে, জমি চাষের পক্ষে যেমন উপকার হবে, তেমনি প্রোটিন ও ভিটামিনে গ্রামের স্বাস্থ্যও উন্নত হবে। গবাদি পশু পালনের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্বার্থপরতা ও অমানবিকতা দানা বাঁধতে পারে। কিন্তু ঐকত্রিক প্রচেষ্টায় ঐ সমস্ত দোষত্রুটি অনেকটা দূর হয় বলে তাঁর ধারণা। তাঁর ভাষায় : "I myself had no hesitation in saying that she could never be saved by individual farming. Her salvation, and with her that of buffalo, could only be brought about by collective endeavour. It is quite impossible for an individual farmer to look after the welfare of his cattle in his own home in a proper and scientific manner." এই প্রসঙ্গে তিনি নয়টি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করেছেন।

প্রথমতঃ, ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে গরুমোষকে নিজের ঘরে রেখে খাওয়াতে প্রচুর টাকা লাগে। ঘরবাড়ীও ময়লা হয়। সেখানে সমষ্টিগত

উপায়ে সেগুলিকে একজায়গায় রাখলে সুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ, গরুমোষের সংখ্যা বাড়লে চাষী তাদের বেচে ফেলে, নতুবা হত্যা করে অথবা অনশনে মরতে দেয়। এই অমানবিক নিষ্ঠুরতা থেকে নিষ্কৃতি হয়, যদি সমবায়-প্রথায় পালিত হয় এরা। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগতভাবে কোন কৃষকের পক্ষে গবাদি পশুর চিকিৎসা করা মুসকিল। অথচ সমবায়ের মাধ্যমে তার অনেক সুবিধা হয়। চতুর্থতঃ, ষাঁড়ের ব্যবহারের প্রসঙ্গেও সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা প্রয়োগ করা চলে। পঞ্চমতঃ, গবাদি পশুর চারণ ক্ষেত্রও সুবিধামত পাওয়া যায় এই সমবায় ব্যবস্থায়। ষষ্ঠতঃ, সমবায় সংগঠনের গবাদি পশুর খাদ্যও কম দামে কিনতে পারা যায়। সপ্তমতঃ, এই রকম সমবায় সংস্থার দুধ ভাল দামে বিক্রি হতে পারে এবং তাহলে বিক্রেতারা কখনই দুধে জল দিতে প্রবৃত্ত হবে না। অষ্টমতঃ, ব্যক্তিগতভাবে কোন গবাদি পশুর শক্তি সামর্থ্য ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করা অসুবিধা। অথচ সমবায়ে তা সম্ভবপর। নবমতঃ, যেখানে কৃষকরা নিজেরা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে না সেখানে তারা গবাদি পশু রক্ষা করবে কি ভাবে? সুতরাং উভয়েরই অবস্থা ব্যক্তিগত ভাবে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অতএব অবশ্যই সমবায়-প্রথার ওপর জোর দেওয়া দরকার।

সমবায়ের পরিধির দিকে দৃষ্টি রেখেই গ্রামীণ শিল্প সম্পর্কে গান্ধীজী মনে করতেন যে, জিনিসপত্রাদি গ্রামের লোকেরা, তাঁদের নিজেদের কুটিরে তৈরী করলেও, একত্র করে বিক্রি করে লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর বিশ্বাস, সমবায় প্রচেষ্টার ইচ্ছা সৃষ্টি হলে সমবায়, শ্রমবিভাগ, সময়সাশ্রয়, কর্মদক্ষতা প্রভৃতি গুণবৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে। তাঁর কথা হল, আমাদের যা কিছু দরকার, তা আমরা সমবায়-প্রথায় প্রস্তুত করব। এইভাবে সমবায়, জীবিকার্জনের ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণে সাহায্য করবে।

শরণার্থীদের সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন যে, তাঁদের সমবায়িক জীবনের কায়দাকানুন ও গুণাবলী সম্বন্ধে সম্যক শিক্ষা প্রদান করা কর্তব্য। তাহলে তাঁদের কাউকে আর পৃথকভাবে থাকতে হবে না। যে প্রদেশেরই বা যে

শ্রেণীরই হোক না কেন, প্রত্যেকেই একত্র হয়ে আত্মকল্যাণের বদলে সর্বজন কল্যাণের কথা চিন্তা করবে। এর অর্থ এই নয় যে, সবাইকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে বাস করতে হবে। আসল কথা হল, সকল নির্যাতিতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার যে বিনীত সুর, সমবায়ের মূলনীতির মধ্যে স্পন্দিত হয়, তার অনুরণন সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হওয়া দরকার।

সুতরাং এই সমবায় প্রথার সাফল্যের জন্য মহাত্মা গান্ধী চেয়েছেন জনগণকে ভেতর থেকে জাগাতে। বাইরে থেকে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে চলবে না। মানব প্রেমই এখানে মূল কথা। সমবায়ই সমাজ গড়ে এবং সমবায়ের প্রতিষ্ঠা দ্বারাই পৃথিবীতে আসবে স্থায়ী ও প্রকৃত প্রগতি।

এইভাবে গান্ধীজী সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে যেমন অহিংস নীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, তেমনি সরকার থেকেও যাতে কোন চাপ না আসে, হিংস্র নীতি আরোপিত না হয়—তার দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন। সহিংসনীতির মাধ্যমে সমবায় প্রতিষ্ঠিত হলে তার ফল খুব খারাপ হবে। শক্তির সাহায্যে সাময়িক সুফল যদি কিছু আসেও, তথাপি তা ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দেয়। পরিবর্তন আনতে হবে অহিংস নীতির মাধ্যমে। প্রেমই সেখানে ব্যক্তিত্বের ভিত্তি। সেটাই চিরস্থায়ী।

শরৎ-আলোকে বঙ্গচাষীভাই

"…চুলোয় যাক গে তোদের জাত—বিচারের ভালো-মন্দ ঝগড়া-ঝাঁটি, বাবা শুধু আলো জেলে দে রে, শুধু আলো জেলে দে। গ্রামে গ্রামে লোকে অন্ধকারে কানা হয়ে গেল ; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা ক'রে দে বাবা! তখন আপনি দেখতে পাবে তারা কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা ধলো।"

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শারদলক্ষ্মী মাথায় শ্বেতশতদল শীতল-শিশির-ঢালা মুকুট পরে তাঁর শুভ্র মেঘের রথে শরৎকালের আলোঝলমল নির্মল নীলপথ বেয়ে আসছে বলে গ্রামবাংলার চাষীভাইরা কাশের গুচ্ছ বেঁধে, শেফালী মালা গেঁথে, নবীনধানের মঞ্জরী দিয়ে ডালা সাজিয়ে এনে দাঁড়িয়েছে—এমন একটি সুখ-সমৃদ্ধি, আনন্দ ও শান্তির চিত্রের ইঙ্গিত শিরোনামে পাওয়া গেলেও, আসলে কিন্তু এটা একটা নিতান্তই দুঃখ-বেদনা, হতাশা ও বঞ্চনার ছবি তুলে ধরার চেষ্টা। আর সেটা অমর কথাশিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ওপর ভিত্তি করে বলেই তাঁর নামটি এইভাবে ব্যবহৃত হল।

আমরা জানি শরৎচন্দ্রের বেশীরভাগ গল্প-উপন্যাসের পটভূমিই হচ্ছে বাংলার পল্লীঅঞ্চল ও গ্রামবাসী। তাঁর রচিত পৃষ্ঠা সংখ্যার অর্ধেকের ওপর হল গ্রামজীবনের পটভূমি এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির অধিকাংশই হচ্ছে গ্রামের লোক। যাঁদের জীবনজ্বালা শরৎবাবুকে সাহিত্যসৃষ্টিতে উদ্দীপিত করেছে, সেই সব সামন্তশৃঙ্খলাবদ্ধ চাষীভাইদের দেখা মেলে শরৎ-রচনাবলীতে। তাঁদের জীবনের শোষণবঞ্চনা, দুঃখ-কান্নার কথাই ফুটে ওঠে শরৎসাহিত্যে। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে নিরন্ন-বুভুক্ষু ভূমিহীন-কপর্দকহীন কৃষিজীবি মানুষদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সকরুণ উক্তি : "প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, অনেকেরই এক ফোঁটা জমি-জায়গা নাই, পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে 'জন' খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। দুদিন

কাজ না পাইলে কিংবা অসুখে বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে।”

শরৎবাবুর চাষীভাইদের প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধ এবং জমিদার-মহাজনদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি ‘অনুরাধা’র হরিহর ঘোষাল, ‘দত্তা’র বনমালী, ‘শেষের পরিচয়’—এর ব্রজবাবু প্রভৃতির ভেতর দিয়ে তাদের চরিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন, যাদের বলা যায় নয়া ভূস্বামীগোষ্ঠী, অর্থাৎ যারা কেবল শহুরে বিলাসপ্রবণ জীবন যাত্রার জন্য মধ্যস্বত্বাধিকারীদের সাহায্যে প্রজাশোষণ করে নিয়মিত রসদ জোটায়। এই গোষ্ঠীর এই ধরনের কাজকারবার গ্রামীণ জীবনে যে কি বিপর্যয় ঘনিয়ে তোলে, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে শরৎচন্দ্রের প্রাণবন্ত ভাষায়ঃ “চিরদিন যারা এঁদের মুখের অন্ন এবং পরনের বস্ত্র যুগিয়ে দেয়, সেই কৃষককুল আজ নিরন্ন, নিরক্ষর এবং নিরুপায় হয়ে মৃত্যু পথে দ্রুতবেগে চলেছে।” সামন্ত অত্যাচারের অগ্নিতে যাঁদের নিজেদের জীবন আহুতি দিতে হয়েছে শরৎ-বিচারে তাঁরাই কিন্তু স্বশ্রমজীব, পরশ্রমজীবি নয়।

শরৎচন্দ্রের কথাই হল যে, জমিদাররা নয়, গরীব কৃষকরাই দেশের যা কিছু সব ধন সম্পদ সৃষ্টির মূলে রয়েছে। অসমর্থ-দুর্বল কৃষকদের শোষণ বঞ্চনার কথা তিনি “পল্লীসমাজ” বইতে বলেছেন। রমেশ, বেণী ঘোষালের কাছে গিয়ে দক্ষিণদিকের বাঁধটা কেটে দেবার জন্য অনুরোধ করলে “সমস্ত গাঁয়ের ধান হেজে” গেলেও “দু তিনশো টাকার মাছ বেরিয়ে যাবার” সম্ভাবনায় বেণী ও রমা বাঁধ কাটতে অস্বীকার করলেন। বরং কৃষকদের সর্বনাশ, যে জমিদার মহাজনদের পৌষমাস, তা উপলব্ধি করা যায়, জমিদার বেণী ঘোষালের নিষ্ঠুর উক্তিতেঃ “…দেখবে, ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে।”

মহাজনদের চরিত্র অঙ্কনের ব্যাপারে শরৎবাবুর ঐতিহাসিক সচেতনতার ইঙ্গিত পাই। এদের সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় লেখনী কামান হয়ে গর্জে ওঠেঃ “পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থিমাংস, পয়সার জন্য ইহারা করিতে পারে না এমন কাজ সংসারে নাই।…মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া

ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের দায়েই হোক বা অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির জন্যই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়। সে সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতিবৎসরই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়।”

শরৎবাবু জমিদার-মহাজন তথা প্রজাশোষক ভূস্বামী গোষ্ঠীকে ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের উক্তির ভেতর দিয়ে তাঁর সামন্তবিরোধী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। যারা প্রজাদের “গায়ের রক্ত অহরহ শুষে খাচ্ছে” তাদের সম্পর্কে “শ্রীকান্ত (৩য়)”-এর সুনন্দর স্বামী যদুনাথ ন্যায়রত্নের উক্তি এবং “বিপ্রদাস”-এ সতীর উক্তির মাধ্যমে সকল অজ্ঞ ও সরল গরীব গ্রামীণ সমাজের প্রতি শরৎবাবুর গভীর দরদ প্রকাশ পায়। ভূস্বামীগোষ্ঠীর বিপক্ষে তিনি যথার্থই আঘাত হেনে কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং জমিদার-মহাজনরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন বলেই “মহেশ” গল্পের লেখকের বিরুদ্ধে তাঁদের উত্তেজিত হতে দেখা যায়।

জমিদার-মহাজনরা আদালতের সাহায্যে মিথ্যা ঋণের মামলা করে কিভাবে কৃষক-রায়তদের জমি হাতিয়ে নেয়, তার কিছু চিত্রও শরৎচন্দ্র এঁকেছেন ‘পল্লীসমাজ’, ‘বড়দিদি’, ‘দেনাপাওনা’, ‘ষোড়শী’ প্রভৃতি গ্রন্থে। তাই তিনি আদালত সম্পর্কে বারবার তিক্ত মন্তব্য করেছেন, ‘শেষপ্রশ্ন’, ‘হরিলক্ষ্মী’, ‘দেনাপাওনা’ ইত্যাদি পুস্তকে।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর মসীলিপ্ত ভূমিকা শরৎচন্দ্রের নজর এড়ায়নি। তাই তাঁর সাহিত্যে এর ইতিহাসসম্মত রূপও তিনি দিয়েছেন। চাষাভূষোদের মধ্যে অশিক্ষাই হল জমিদার-মধ্যস্বত্বাধিকারীদের শোষণ ও প্রবঞ্চনার প্রধান হাতিয়ার। গ্রামীণ জীবনে শিক্ষার প্রসার তাঁদের স্বার্থবিরোধী বলেই সেসব প্রচেষ্টাকে রুখে দেবার জন্য তাঁরা সর্বপ্রকার জঘন্য পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

এই সব ব্যাপার শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন ‘পল্লীসমাজ’-এ পিরপুরগ্রামে স্কুল করার ব্যাপারে বেণীমাধবের কিছু উক্তির ভেতর দিয়েঃ “…প্রজারা… যদি লেখাপড়া শেখে তাহলে জমিদারী থাকা না-থাকা সমান হবে…।”

আবার বেণীমাধব বলেছেনঃ "সে যে আমাদের সমস্ত প্রজা এমনি করে বিগড়ে তুলবে, আর জমিদার হয়ে আমরা চোখ মেলে মুখ বুজে দেখব, সে যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে।" শরৎচন্দ্রের বাস্তবজীবনেও গ্রামে শিক্ষার প্রসারে উৎসাহ ও প্রেরণা ছিল প্রচুর। তাঁরই উদ্দীপনায় সামতায় প্রতিষ্ঠিত হয় "শরৎচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়"।

শরৎচন্দ্র সেচব্যবস্থার ওপর নিদারুণ অবহেলা, অথচ রেলপথ তৈরীর মাধ্যমে কৃষকশ্রেণীর যথাসর্বস্ব লুটে পুটে নেবার বৃটিশ অপকৌশল লক্ষ্য করে শ্রীকান্ত উপন্যাসে গভীর দুঃখের সঙ্গে জানানঃ "... দীঘি নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও একফোঁটা খাবার জল নেই, ... কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেচে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে।" 'পথের দাবী'-তেও তাঁর এরকম বেদনায় ভরা বাণী শোনা যায়ঃ "নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠেছে, চাষা পেটপুরে খেতে পায় না।"

শুধুমাত্র রায়ত-কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থার কথাই নয়, তাঁরা যে পথ দিয়ে চলাফেরা করেন, সেই গ্রাম্য পথের সম্বন্ধে বলতে গিয়েও শরৎবাবুর বিদ্রূপাগ্নি বর্ষিত হয়েছে প্রচণ্ডভাবেঃ "গ্রামের লোক জানে অনুযোগ-অভিযোগ বিফল—তাহাদের জন্য কোনদিনই রাজকোষে অর্থ নাই—তাহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু 'পথকর' যোগাইতে হয়, কিন্তু সে পথ কোথায় এবং কাহার জন্য এ সকল চিন্তা করাও আমাদের কাছে বাহুল্য।" ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা তাঁকে দেখি, একবার দেউলটি থেকে মেল্লক গ্রাম পর্যন্ত রাস্তাটা খুব খারাপ থাকায়, গ্রামের লোকের চলাফেরার ভীষণ কষ্ট ভেবে, শরৎচন্দ্র ডি. এম.কে বিষয়টি জানিয়ে বহু তদ্বির করে রাস্তা তৈরী করালেন।

শরৎচন্দ্রের মতে গ্রাম-বাংলার মানুষ কূপমণ্ডুকতা, দলাদলি, কুসংস্কার গোঁড়ামী প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন। তাই এঁদের সচেতন করে, অধিকারবোধ জাগিয়ে এবং শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠিত করার কাজে যাঁরা অগ্রহী হবেন, তাঁদের শরৎচন্দ্র পরামর্শ দিয়েছেন, গ্রাম ছেড়ে দূরে গিয়ে, বিদেশে

বেরিয়ে পড়ে মানুষ হতে, কিন্তু কাজ করতে হবে গ্রামে বসে এবং গ্রামের ভালমন্দ সব রকম লোকের সঙ্গে ভাল করে মিল করে নিয়ে। তাঁর 'পল্লী-সমাজ' গ্রন্থে দেখি যখন গ্রামবাসীদের নিকৃষ্টমন ও সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে রমেশ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন, তখন তাঁকে নিবৃত্ত করতে জ্যাঠাইমা বলেছেন : "তোর মতো বাইরে থেকে যারা বড় হতে পেরেছে তারা যদি তোর মতোই গ্রামে ফিরে আসত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এমন দুরবস্থা হতে পারত না।"

সুতরাং শরৎচন্দ্রের বক্তব্য যে, উন্নত চেতনার অধিকারী হয়ে গ্রামে যেতে হবে এবং কৃষিজীবি মানুষের শরিক হিসাবে, তাঁদের মধ্যে থেকে, তাঁদের দুঃখ-দুর্দশায় অংশগ্রহণ করে, গ্রামীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করা চাই। গ্রামের উন্নতি ঘটাতে হলে ও গ্রামীণ শোষকদের বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজাদের সংগঠিত করতে হলে শিক্ষা ও মধ্যবিত্ত সুলভ শ্রেষ্ঠত্বের অহংভাব ঝেড়ে মুছে ফেলে কৃষক সম্প্রদায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে, তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে হবে। তবেই কৃষককুল শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে আপনজন বলে মেনে নিয়ে, তাঁদের নেতৃত্বে বিশ্বাসী হবেন। শরৎচন্দ্র এই আদর্শই আবার প্রচার করেছেন 'পণ্ডিতমশাই' বইটিতে।

বহু কর্মী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এই সব নব নব আদর্শ ও আলোকের সন্ধান পেতে থাকেন। এমনকি, তিনি নিজেও কাঁধে গামছা ফেলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ফিরে, প্রত্যেক গ্রামবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেলামেশা করেছেন এবং সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের কাছ থেকেই তাদের নিজস্ব হাসিকান্নার খবর নিয়ে, হৃদয়ঙ্গম করেছেন প্রকৃত পল্লীসমাজকে। আর তাই জমিদারী-বিলোপ ও পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে শোষণমুক্ত সমাজগঠনের জন্য রায়ত জাগরণ ও আন্দোলনের কিছু আভাসও তিনি দিয়েছেন 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা' 'জাগরণ' প্রভৃতি গ্রন্থে।

শরৎচন্দ্র বঙ্গ চাষীভাইদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিশিয়ে দিয়ে যে সমস্ত অমূল্য রত্ন আহরণ করেছেন এবং তা দিয়ে তাঁর

নিপুণ লেখনীর সাহায্যে সাবলীল ভাষায় তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার যেসকল ছবি এঁকেছেন ও সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন তার তুলনা হয় না। যদিও সেসবই সেই যুগের এবং সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, তবুও দিনকাল আজ অনেক বদলে যাওয়া সত্ত্বেও, বিভিন্ন দিকে নানান উন্নতির কিছু কিছু ছোঁয়া লাগলেও, তাঁর অমর কথাশিল্প সমকালীন হয়েও চিরকালীন হয়ে, সে যুগের পাঠকের মতো এ যুগের পাঠককেও শোষণ-প্রবঞ্চনার মুক্তির সংগ্রামে এগিয়ে আসতে প্রেরণা যোগাবে।

যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে যে বিত্তবান-প্রভাবশালী মানুষের কাছে গরীব-অসহায় মানুষ কেবলই বঞ্চিত ও প্রবঞ্চিত হয়ে মার খাচ্ছে, তার কিছুটা প্রশমিত হলেও, এখনও কিন্তু নেহাৎ কম চলছে না। বর্তমানে কৃষি উৎপাদন অনেকটা বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ চাষীভাই কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছে। অতএব শরৎচন্দ্র প্রভৃতি গ্রাম-দরদী, কৃষক-দরদী, দরিদ্র-দরদী মহাপ্রাণ ব্যক্তির শিক্ষা ও আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের সকলকে সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে, কৃষি-মঙ্গলের তথা সমগ্র গ্রামোন্নয়নের নতুন কর্মযজ্ঞে।

নজরুল ও কৃষক-বিদ্রোহ

"জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা ॥
তোমার স্নেহ যায় বয়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে,
ঘরে ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল হ'তে,
স্নিগ্ধ-ছায়া মাটির বুকে তোমার শীতল-পাটী পাতা ॥"
—কাজী নজরুল ইসলাম

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামবাসী। তাদের বেশীর ভাগই আবার কৃষক বা অনুরূপ জীবিকাবলম্বী। তারা অজ্ঞ ও অবহেলিত। অতএব তাদের জাগিয়ে না তুলতে পারলে গ্রামোন্নয়নের কোন প্রকল্পই সফল হতে পারে না। তাই সেই কাজই করতে চেয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি "বিদ্রোহী" কবি বলে খ্যাত। অবশ্য এই আখ্যা অনেক সময় অনেকের মনে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ "আমাকে 'বিদ্রোহী' বলে খামকা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোন দিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।" আসলে কিন্তু তাঁর বিদ্রোহ রাজার বিরুদ্ধে নয়, নয় তা কোন ব্যক্তিগত নৈরাজ্যবাদ। এই বিদ্রোহ কেবলমাত্র সমস্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য, অন্যায় ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, সামন্ত-তান্ত্রিক জোয়ালের বিরুদ্ধে।

নজরুলের কাব্যচর্চার বিশেষ বিষয় হয়ে উঠেছে সেই সময়ের সমাজ, রাজনীতি ও মানুষ। সে সব ঘিরেই চলত তাঁর কাব্য সাধনা। সেদিন যে পালা পরিবর্তনের ইঙ্গিত সমাজের সর্বত্র প্রকাশ পাচ্ছিল, তাকে তিনি অস্বীকারতো করেনইনি, উপরন্তু নিজের ইচ্ছায় সেটা বরণ করে নিয়েছিলেন। তখন তিনি প্রগতির স্বার্থে নিজস্ব প্রত্যয়ের সাথে যোগ করে দিয়েছিলেন

কাব্যের আপন ধর্মকে। তাই তাঁর রচনার ভেতর দিয়ে শুনতে পাই সমগ্র শোষিত মানব সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্মবাণীর প্রতিধ্বনি। তিনি চেয়েছিলেন কৃষক-মজুরের স্বাধিকার আন্দোলনের সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

নজরুলের এই প্রয়াসের মূলে তৎকালীন পটভূমিকার প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। বিশেষ করে কৃষক—বিদ্রোহের ব্যাপারে তাঁর মনে বিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তিতুমীর নামে, বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসতের নারকেল বেড়ে গ্রামের এক দরিদ্র মুসলমান কৃষক, যিনি ইংরাজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম চাষীভাইদের সংগঠিত করে "বাঁশের কেল্লা" থেকে যুদ্ধ করে ইংরেজের হাতে প্রাণ দেন। নজরুলও কৃষক সম্প্রদায়ের শ্রেণী সংহতি ও সংঘবদ্ধ শক্তির ওপর আস্থাবান হয়ে তাঁদের শক্তির সপক্ষে সোচ্চার হয়েছেন: "হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক···তোমার হাতের ঐ লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক।···চালাও লাঙল···।"

"সর্বহারা" বইয়ের গোটা দশেক কবিতায়, যেমন, কৃষাণের গান, ধীবরদের গান, শ্রমিকের গান প্রভৃতিতে নজরুলের কৃষক, জেলে, শ্রমিক প্রভৃতির প্রতি সহৃদয়তা ও সমর্থন লক্ষণীয়। চাষীভাইদের পরিশ্রমজাত ফসল দখল করে নেওয়ার জন্য তাঁদের দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা, অভাব-অনটনের সীমা—পরিসীমা নেই দেখে তাঁর কণ্ঠে বেজে ওঠে বেদনার সুর:

"ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ?"

পুঁজিবাদী সমাজ কৃষকদের জোঁকের মতো শোষণ করে তাঁদের উপোসী রেখে, তাঁদেরই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমপ্রসূত চাল ফুটিয়ে মদের বোতল ভর্তি করে, ফুর্তির ফোয়ারা ছোটাচ্ছে, তাতে নজরুল যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আবার লিখলেন:

"আজ চারদিক হ'তে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত,
ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা নাই ক' আমার হাত।"

এইরকম শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। জমির স্বত্ব রক্ষার জন্য চাষী ভাইদের তাই তিনি এইসব অত্যাচারী বণিক জোতদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেছেন, আহ্বান জানিয়েছেন সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়কে জেগে উঠে সংগঠিত হবার জন্য ঃ

"ওঠরে চাষী, জগদ্বাসী, ধর ক'সে লাঙ্গল।
আমরা মরতে আছি—ভাল করেই মরব এবার চল॥"

এই গানটি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় হেমন্ত কুমার সরকার লিখেছেন ঃ "কনফারেন্সের জন্যে গান লেখার ফরমাস করা গেল নজরুলকে। তাকে একটা ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আদায় করলুম দুটি গান— 'ধ্বংস পথের যাত্রীদল', আর 'ওঠরে চাষী জগৎবাসী ধর কসে লাঙ্গল।' বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের গান ছিল না এর আগে, নজরুলই তার পথকার।" ঐ গানেই নজরুল আবার বলেছেন ঃ

"আজ জাগরে কিষাণ! সব তো গেছে কিসের বা আর ভয়?
এই ক্ষুধার জোরেই মরব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যু রাজার হয়কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্য জগৎ চাষার কত বল॥"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বছরে অর্থাৎ ১৯১৭ সালে নজরুল যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন তিনি টেষ্ট পরীক্ষা চলাকালীন অবস্থায় বড় বড় পোষ্টারে বাঙ্গালী যুবকদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের আহ্বান লক্ষ্য করলেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরীক্ষা ত্যাগ করে নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের ছেলে শিয়ারসোল রাজস্কুলের কৃতী ছাত্র কাজী নজরুল ইসলাম বেরিয়ে এসে যোগ দিলেন বেঙ্গল রেজিমেণ্টে। সৈন্য ব্যারাক থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে এবং লম্বা লম্বা সব চিঠিপত্র লিখে নিজের এইসব উপলব্ধির কথা প্রকাশে ছিলেন সোচ্চার। ১৯২০ সালের

মার্চ মাসে তিনি সেনাবাহিনী থেকে দেশে ফিরে এলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের, বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার, সংকল্প গ্রহণ করে।

সেনাবাহিনীতে যোগদানের পূর্বে দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার জন্য জোরদার যে আকর্ষণ নজরুলের ভেতর প্রভাব ফেলেছিল সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর স্বদেশমুক্তির ভাবনা তাঁর সেই কবি মানসকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বাংলার বহু বিপ্লবী গোষ্ঠীর কর্মসূচী তাঁর মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছিল। ইংরেজদের যে ভারত ছাড়তেই হবে, সে কথা অনেকের ন্যায় নজরুলও নিশ্চিতরূপে মনে করেছিলেন। তাঁর এই গণচেতনার ভেতর দিয়েই তিনি নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন সাহিত্য সভায়। তাঁর কবিতায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন উদ্দীপনার ভাব। আর তাকে মূলত স্বাধীনতার স্বপক্ষে দেশের নিপীড়িত মানুষদের জাগিয়ে তোলার কাজে নিয়োজিত করলেও, সেটা পরিণামে পরিণত হয়েছে পৃথিবীর সমগ্র শোষক ও শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বানে।

এইভাবে সমাজে ভীষণ ভণ্ডামি ও অসহ্য অত্যাচারের অবসান ঘটানোর প্রয়াস পরিব্যাপ্ত হয় পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে। উদ্দীপক ভাবে ভাবিত তাঁর কবিতার শব্দে শব্দে শুনতে পাওয়া যায় সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত ও সর্বহারাদের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সত্যকে জানতে হলে বিদ্রোহের বিশেষ প্রয়োজন। ঠিক ঠিক বিদ্রোহ করতে পারলে কল্যাণ আসতে বাধ্য। তিনি সঠিক সচেতনতার সঙ্গে সমাজের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁর বিদ্রোহকে তিনি স্বয়ং ব্যাখ্যা করেন: "উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্যবারি ...আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই—অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।" এই সুস্পষ্ট স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে। "বিদ্রোহ" ব্যাপারটি, বিষয়বস্তু হিসাবে তাঁর কাব্যের কেবল অন্তর্ভুক্ত। আসলে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার ভেতরে তাঁর প্রেমিক সত্তার অস্তিত্ব অদৃশ্য ঐক্যের স্বপক্ষে গোড়া থেকেই কার্যকর। তাঁর কাব্যের পরিপূর্ণতার

পরিচয় পাওয়া যায়, এই দুটি ভিন্নধর্মী সত্তার মিলনের মধ্যেই। তিনি শুধু মানবতাবাদী ভূমিকায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে তাঁর কবিতাকে ব্যবহার করেছিলেন বৈপ্লবিক বোধের স্ফুরণে।

কাজী নজরুল ইসলামের এই উজ্জীবন বা জাগরণের কবিতা লেখার সময় হ'ল ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল। এই কালটি নানান কারণে তাঁর কাব্যধারার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বের কবিতাগুলি রচিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকার ওপর। তখন তিনি সবে সেনাবাহিনী থেকে প্রবল প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে ফিরে এসেছেন। আর সঙ্গে রয়েছে কাব্য সাধনার সিদ্ধ হবার বিশেষ বাসনা। এই দুইয়ে মিলে নূতন দিগ্‌দর্শনের দ্যোতনা করে বাংলা কাব্যজগতে। তখনকার বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব পরিস্ফুট তাঁর কবিতায়। এই পর্বে প্রথম পাই ১৯২২ সালে তাঁর "অগ্নিবীণা" কাব্যগ্রন্থ। এরপর ১৯২৩ সালে "দোলন চাঁপা" এবং ১৯২৪ সালে "ভাঙ্গার গান" ও "বিষের বাঁশী"। আবার ১৯২৫ সালের "সাম্যবাদী", ১৯২৭ সালের "সর্বহারা" প্রভৃতি গ্রন্থের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা যায়।

বিদ্রোহের বাণী, কৃষক-শ্রমিকের স্বাধীনতা আদায়ের কথা লেখার জন্য ১৯২০ সালের জুলাই মাসে নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমেদের যুক্ত সম্পাদনায় প্রকাশিত হল সান্ধ্য দৈনিক "নবযুগ" পত্রিকা। এ সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের সুন্দর স্মৃতিচারণঃ "নির্দিষ্ট দিনে কাজী নজরুল ইসলাম ও আমার সম্পাদনায় "নবযুগ" বার হলো। নিশ্চয়ই নজরুলের জোরালো লেখার জন্যে প্রথম দিনেই কাগজ জনপ্রিয়তা লাভ করল। হিন্দু-মুসলমান দু'জনাই কাগজ কিনলেন। ফজলুল হক্ সাহেবের মেশিন খোঁড়া ছিল ব'লে আমরা চাহিদা মেটাতে পারলাম না। রয়েল সাইজের এক শীট্ কাগজের দাম করা হয়েছিল এক পয়সা। কাগজে নজরুল ইস্‌লাম ও আমার নাম ছাপা হত না। প্রধান পরিচালক হিসাবে এ. কে. ফজলুল হকের নাম ছাপা হতো।···আমরা যখন 'নবযুগ' বা'র করি তখন ফজলুল হক্ সাহেব আমাদের কাগজের কোনো নীতির কথা বলেননি। শুধু বলেছিলেন কৃষক ও শ্রমিকের কথাও তোমাদের লিখতে হবে।"

এইসব কথা আরো লিখেছেন তারপর মুজফ্‌ফরের সহায়তায় ১৯২২ সালে অর্ধসাপ্তাহিক "ধূমকেতু"—তে। এক্ষেত্রেও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের লেখার উদ্ধৃতি দেওয়া চলে: "নজরুলই কাগজের নাম স্থির করল 'ধূমকেতু'।...বাণী চেয়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (তখন পণ্ডিচেরিতে ছিলেন) এবং আরও অনেককে পত্র লিখেছিলেন। বাণী তাঁদের নিকট হতে এসেওছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাণীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কবিতায় নজরুলকে নিম্নলিখিত কয় ছত্র পাঠিয়েছিলেন:

কাজী নজরুল ইস্‌লাম কল্যাণীয়েষু

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্‌ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্‌না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে'
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।

...১২ই আগস্ট (১৯২২) তারিখে 'ধূমকেতুর' প্রথম সংখ্যা বার হলো। শিক্ষিত তরুণদের ভিতরে সঙ্গে সঙ্গেই তা জনপ্রিয়তা লাভ ক'রে ফেলল। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ মাথায় বহন করেই 'ধূমকেতু' বা'র হতে লাগল।"

এরপর ১৯২৫ সালে সাপ্তাহিক "লাঙল"-এ এবং ১৯২৬ সালে সাপ্তাহিক "গণবাণী"-তেও ঐ সমস্ত কথা বলা হয়েছে প্রাণ উজাড় করে। ১৯২৫ সালের নভেম্বরে গঠিত "শ্রমিক-প্রজা সম্প্রদায়"-এর সাপ্তাহিক মুখপত্র "লাঙল"-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালের ২৫ শে ডিসেম্বরে। সম্পাদক ছিলেন শ্রী মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং নজরুল ছিলেন প্রধান পরিচালক। "লাঙল"—এই নামের সঙ্গেই কৃষক-জীবনের

সুর বাজছে। নজরুলের বিখ্যাত "কৃষাণের গান" কবিতাটি, এর দ্বিতীয় সংখ্যায়, অর্থাৎ ১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারী প্রকাশিত হয়।

ধীবরদের সম্মেলনের জন্য রচিত "ধীবরদের গান" কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম ধীবর জীবনের ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখের কথা কয়েছেন অত্যন্ত আবেগভরে ; প্রেরণা দিয়েছেন তাদের উঠে দাঁড়াতে ঃ

> "আমরা নীচে প'ড়ে রইব না আর শোন্‌রে ও ভাই জেলে
> এবার উঠব রে সব ঠেলে।"

এটি প্রথমে "লাঙল" পত্রিকার ১৯২৬ সালের ১৪ই মার্চ সংখ্যায় "জেলেদের গান" নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

শোনা যায় যে, নজরুলের প্রীতিমুগ্ধ সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের কাছে "লাঙল"—এর জন্য আশীর্বচনের আবদার করায় অনায়াসেই লিখে ছিলেন ঃ

> "জাগো জাগো বলরাম, ধর তব মরুভাঙা হল,
> প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল ॥"

আর এটা নাকি "লাঙল"—এর পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে ছাপা থাকত। আবার পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নিবন্ধের উপসংহারে লেখা হয়েছিল ঃ "হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, ব্রহ্মাণ-অব্রাক্ষণ সমস্যা সব লাঙলের ফালের মুখে লোপ পাবে। তাই আমরা লাঙলের জয়গান আরম্ভ করলাম। লাঙল নবযুগের নবদেবতা। জয় লাঙলের জয়—জয় লাঙলদেবতার জয় ॥" এতে এই যে আশা অনুরণিত হয়েছে, বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

"লাঙল" ছিল স্বল্পায়ু। মাত্র ১৫ খানা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ সংখ্যাটি ১৯২৬ সালের ১৫ই এপ্রিল প্রকাশিত হয়। পরে ১৯২৬ সালের ১২ই আগস্ট পত্রিকাটি "গণবাণী"-র রূপ নেয়। জানা যায় যে, "লাঙল"—এর যখন অবলুপ্তি ঘটল, তখন তার সম্পাদক মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিবাগী হয়ে সংসার ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে স্বামী বিরূপাক্ষানন্দ নামে পরিচিত হন।

এইরূপে আমরা দেখি যে, নজরুল ক্রমশঃ কৃষকদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে সংগঠন গড়ে তোলায় মগ্ন হয়ে কৃষক বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করেন। প্রথমে **Labour Swaraj Party** ও পরবর্তী কালে **Workers and Peasants party** এবং এই উদ্যোগের পরের প্রচেষ্টা "বঙ্গীয় কৃষক লীগ" গঠনে নজরুলের ভূমিকা ছিল প্রধান।

১৯২৪ সালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে কাজী নজরুল ইসলাম গাইলেন "চরকার গান":

"ঘোর্‌-ঘোর্‌ রে ঘোর্‌ ঘোর্‌ রে আমার সাধের চর্‌কা ঘোর।
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর॥"

তারপর ১৯২৫ সালে **The Labour Swaraj Party of the Indian Natinal Congress**—এর প্রথম ইস্তাহারে স্বাক্ষর দান করেন নজরুল।

১৯২৫ সালের ১লা নভেম্বর হেমন্ত কুমার সরকার, কুতুবুদ্দিন আহ্‌মেদ এবং শামসুদ্দিন হুমায়ুনকে নিয়ে নজরুল **Labour Swaraj Party** গঠন করেন। ঐ বছরেই আবদুল হালিমের সঙ্গে বসিরহাটে গিয়ে নজরুল কুতুবুদ্দিন আহ্‌মেদের নির্বাচনী প্রচারের জন্য স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে সভা-সমাবেশ করেন।

১৯২৬ সালের ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী ময়মনসিংহ-এ (বর্তমান বাংলা-দেশে) যে জেলা কৃষক-শ্রমিক সম্মেলন হয়, তার জন্য চিরবিদ্রোহী কবির বাণী প্রেরিত হ'ল: "এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর শস্য শ্যামল মাঠ—আপনারা কৃষাণ ছাড়া তাহার জন্য অধিকারী কেহ নাই।···এই মাঠকে জিজ্ঞাসা কর—মাঠে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে, এ মাঠ চাষীর, এ ফুল-ফল-কৃষক বধূর।"

১৯২৬ সালের ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে "নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলন"-এর দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। তার উদ্যোক্তা ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই ব্যাপারে মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের স্মৃতিকথার কিছুঅংশ শোনা যাক্‌ "১৯২৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী

তারিখে এই সম্মেলন উপলক্ষে সকালবেলায় একটি ট্রেনে শিয়ালদা স্টেশন হতে রওয়ানা হয়ে আমরা কৃষ্ণনগর পৌঁছেছিলাম। আমরা মানে আমি, আবদুল হালীম, কুতুবুদ্দিন আহ্‌মদ ও শামসুদ্দীন হুমায়ুন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেদিন আমাদের সঙ্গেই গিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগর রেলওয়ে স্টেশনে নজরুলের সঙ্গে আমার দেখা হল তিনি বছরের পরে।...নজরুল ইস্‌লামের 'শ্রমিকের গান' এই সম্মেলনেরই উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে রচিত হয়েছিল। সে নিজেই সম্মেলনে গানটি গেয়েছিল।"

১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে অংশগ্রহণের পূর্বে নজরুল ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হয়েছিলেন এবং বন্ধু হেমন্ত সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সভার নির্বাচনে মুসলমান সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে হেরে যান। আবার মুজফ্‌ফার আহমেদের লেখা বিভিন্ন তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নজরুল ও তিনি একসঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত কুষ্টিয়ায় একটি কৃষক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

এ সব ছাড়াও আমরা জানি যে, নজরুল যখনই যে সমস্ত সভাসমাবেশে গেছেন, তখনই সে সমস্ত এলাকার কৃষক-মজুরদের নিয়ে নানান আলাপ আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। এভাবে কৃষক বিদ্রোহের শ্রেণী সংগ্রামের পর্যায়ে উত্তরণের ব্যাপারে নজরুল যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তার তুলনা হয় না। অত্যন্ত উদারতার সঙ্গেই তিনি গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ-কেই করেছেন তাঁর মানবপ্রেমের ভিত্তি। তিনি চেয়েছেন সাম্যবাদী ধ্যানধারণার প্রেক্ষাপটে বিশ্বমানবতাবোধের উদ্বোধন করতে।

॥ উনিশ ॥

উপসংহার

ভারত গ্রাম-প্রধান দেশ। এই দেশের মানুষদের সামগ্রিক সমুন্নতি সাধনই স্বাধীন ভারত সরকারের উদ্দেশ্য। এর জন্য চিন্তা-ভাবনা চলে আসছে বহু বছর আগে থেকেই। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়েছে। এই কমিশন আধুনিক অর্থনৈতিক নীতির নির্দেশ মতো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিযুক্ত রয়েছে নানান অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজে। তার মধ্যে আবার ক্রমশ গ্রামোন্নয়নের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দৃঢ় করে তুলতে চাইছে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ।

খুবই ভালো কথা। এটি যে বেশ প্রশংসনীয় উদ্যোগ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজও যে কিছু কিছু না হয়েছে তা নয়। অথচ আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। আয়োজনের তো অভাব নেই; কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? আমাদের মূল সমস্যাটা কি? কোথায় কোথায় নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, কোন্ কোন্ দিকে আমরা অনুসরণ করছি ভ্রান্ত পথ প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তরের উৎস সন্ধানে স্মৃতিচারণ করা দরকার আমাদের মনীষীদের উপদেশ ও কর্মদৃষ্টান্তের। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বর্তমান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদেরও অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত করে নিতে হবে সেই সব বিষয়।

অবশ্য এর অনেক আগে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগেও বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঠিকই। স্বভাবতই সেরকম জোরদার কাজ কিছু হয়নি। বিভিন্ন মনীষীরাও বহু চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে পরাধীনতার শৃঙ্খলে প্রচুর প্রতিকূলতার মধ্যেও পথ করে অনেকে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন। বহু ব্যর্থতার ব্যথাও বুকে বহন করতে হয়েছে অনেকের। তবে মোটামুটি একটা দাগ রেখে গেছেন প্রায় প্রত্যেকেই। দেশকে দিয়ে গেছেন একটা আদর্শ।

আজ পরাধীনতার শৃঙ্খল আমরা ভেঙেছি। স্বাধীন ভারতে নব উদ্যমে কাজ চালাচ্ছি। তৈরী হচ্ছে নিত্য নতুন গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প। খোলা হচ্ছে

Regional Rural Banks, স্থাপিত হয়েছে National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD); আবার সম্প্রতি সংশোধিত বিশ-দফা কর্মসূচীকেও দেখা যায় গ্রাম-প্রধান হতে।

সেকালের সমস্যার সমাধান সামান্য কিছু ইতিমধ্যে হলেও নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কিছু সমস্যা তো চিরন্তন। আর আজ-কালকার এই গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচীর সূত্র কিন্তু মনীষীদের সেকালের ভাবনা-চিন্তা ও ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে নিহিত। একটু গভীর ভাবে গবেষণা করলে হয়তো দেখা যাবে যে, এসবের আয়োজন অনেক আগেই, অন্যরূপে হয়তো একটু, করা হয়েছিল বিভিন্ন মনীষীদের দ্বারা।

কৃষি-প্রধান ভারতের ভূমিতান্ত্রিক সমাজে কৃষকের সমস্যা এক বিরাট সমস্যা। আর এই ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাস প্রধানতঃ সমগ্র সমাজেরই ইতিবৃত্ত এবং এতে ফুটে ওঠে পুরো সামাজিক বিবর্তনের চিত্র। তাই আমাদের মনীষীদের সামাজিক দায়িত্ববোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে কৃষকের ভাবনায়।

ইংরেজ কর্তৃক হস্তবুদ ব্যবস্থা প্রচলন এবং তার সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নানারকম প্রজাস্বত্ব আইনের প্রয়োগের ফলে বদল হয় সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতির। মাত্র দু-একটি শোষণকারী শ্রেণীর জায়গায় দেখা দিল বহু শ্রেণী। এইভাবে ইংরাজ শাসন কায়েম হবার সাথে সাথেই শুরু হল বাংলার তথা পুরো ভারতের দুর্গতির ইতিহাস, যেটা মূলতঃ ভূমি ও কৃষি দুর্গতিরই ইতিহাস। আর এই ইতিবৃত্ত আমাদের মনীষীরা মনে প্রাণে অনুভব করে তাঁদের রচনায় ধিক্কার জানিয়েছেন সরকার বাহাদুরকে। ওকালতি করেছেন রায়তের হয়ে। বলেছেন চাষীই জমির আসল মালিক। অথচ সেই চাষীই মধ্যস্বত্বভোগী কর্তৃক ঋণজর্জরিত ও নিষ্পেষিত। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার কুফল ভোগ করে তারাই।

নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! যারাই আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড, তারাই মরছে মার খেয়ে। অতএব এদের অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে গ্রামীণ

অর্থনীতির উন্নতির উপায় উদ্ভাবন না করতে পারলে সমস্ত ভারতীয় অর্থনীতিই ভেঙে পড়বে। এই কথা বুঝেই আমাদের মানবিকতানুশ্রয়ী মনোভাবাপন্ন মনীষীরা শুধুই নাগরিক সভ্যতার সামিল না হয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির জন্যও কিছু কাজ ও চিন্তা করেছেন। সেটাই সকলের সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার বিনীত প্রয়াস পাওয়া গেছে পুরো পুস্তকটিতে।

বয়স অনুসারে এখানে প্রথমে রামমোহন, তারপর বঙ্কিমচন্দ্র এবং পর পর রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, গান্ধীজী, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এঁরা কেউই অর্থনীতিবিদ নন। কেউ কেউ ধর্মীয় নেতা, অনেকেই সাহিত্যিক, কেউ কবি, কেউ বা রাজনীতিবিদ্। অথচ এঁরা প্রত্যেকেই অর্থনীতির অনেক বিষয়, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির অসংখ্য খুঁটিনাটির খোঁজ-খবর রাখতেন এবং সে সমস্ত সমস্যার সম্যক সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের এই দিকটা অনেকের কাছে আজও তেমন স্পষ্ট নয় বলেই এ সম্বন্ধে এই রকম আলাদাভাবে আলোকপাত করা হল।

এখানে যাঁদের কথা আলোচিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে রামমোহন বয়োজ্যেষ্ঠ। আর তিনিই এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। যদিও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর আগে অনেক অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও কাজকর্ম করেছেন, তবে সেগুলি সবই প্রায় শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির প্রসার নিয়ে। রামমোহনই প্রথম কৃষি ভারতের নগ্নরূপ দেখিয়ে তা নিয়ে আলোড়ন তুলেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কৃষিপ্রধান ভারতের কৃষককূলের অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতির পথ প্রদর্শন করে গেছেন তিনি।

আমরা জানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো সুদূর প্রসারী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা রামমোহন রায়ের কালেই প্রবর্তিত হয়েছিল এবং তাতে আমাদের অর্থনৈতিক জগতে যে বিপর্যয় ঘটে, সে ব্যাপারে তিনি বেশ অবহিত ছিলেন বলেই তাঁর বহুমুখী চিন্তার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে রায়ত-চিন্তাও স্থান পেয়েছিল। উডফোর্ড ও ডিগবী সাহেবের দেওয়ান হিসাবে ১১ বছর কাজ

করার ফলে রামমোহন রায়তদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন, লাভ করেন প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং পরিচিত হন পাশ্চাত্য অর্থনীতি ও কৃষিচিন্তার সঙ্গে। তাই তিনি বুঝেছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষী ও ক্ষেতমজুররা বঞ্চিত হচ্ছে এবং সেদিকে কোম্পানি বাহাদুরের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকেও দেখেছি বঙ্গদেশের কৃষকদের জন্য কি নিদারুণ করুণা করতে। তাদের অত্যাচারের অবসানের জন্য তিনি তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীকে ব্যবহার করেছেন দৃঢ়ভাবে। বাংলার চাষী সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্য সম্বন্ধে বঙ্কিম যে কতখানি সজাগ ছিলেন তার নিদর্শন "বঙ্গদেশের কৃষক" রচনাটি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্থ যে বাঙালী চাষীর সর্বনাশের কারণ, সেকথা তিনি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করেছেন। উচ্চবর্ণ ও ধনীশাসিত সমাজ বঙ্গ রায়তকে যে অবস্থাতে রেখেছে, তার তিনরকম ফল বঙ্কিম দেখেছেন—দারিদ্র্য, মূর্খতা এবং দাসত্ব। তাই রায়তের হয়ে ওকালতি করার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বঙ্কিম বলেছেন: "বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনুষ্য নিতান্ত দুর্দশাপন্ন এবং আপনাদের দুঃখ সমাজ মধ্যে জানাইতে জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে।"

আর রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই। রামমোহন যেমন রাজা হয়েও, রবীন্দ্রনাথ তেমনি জমিদার হয়েও, রাজকীয় বিলাসিতা ও জমিদারী অত্যাচারের অবসানের জন্য বিরোধীতা করেছেন নিজেদের অবস্থাকে। ওকালতি করেছেন প্রজাদের হয়ে। নিজের জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্ব পেয়েই রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলে গেল। খুলতে চাইলেন অপর সকলের চোখও তিনি। কাব্যজগতের কল্পলোক থেকে নিজে নীচে নেমে এসেছেন মাটির টানে। অন্য সবাইকেও টেনে আনার জন্য ডাক দিয়েছেন:

"ফিরে চল্, ফিরে চল্ ফিরে চল্, মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।"

কত না কাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জমিদারীতে সাফল্যে

-ব্যর্থতায়। সৃষ্টি করেছেন শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন। রেখে গেছেন বিশ্বের কবি, বিশ্বের কাছে তাঁর এক বিশেষ কীর্তি। মহামনীষী টলষ্টয় যেমন নিজের হাতে চাষ করেছেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও দেখা গেছে, "হলকর্ষণ" উৎসবে লাঙ্গল ধরতে। নন্দলাল বোসের সুন্দর "ফ্রেসকো"তে তা অমর হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন সম্বন্ধে সুপারিশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পল্লীতথ্য সংগ্রহ, ক্লাব, মিলন-মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, আদর্শ খামার বা কৃষিক্ষেত্র স্থাপন সমবায় প্রথার প্রচলন, ধর্মগোলা খোলা, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, মাদকদ্রব্য ব্যবহার বন্ধ, সাম্প্রদায়িক সাম্য ও সদ্ভাব সংবর্দ্ধন, স্থানীয় শিল্পোন্নতির চেষ্টা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, সুনীতি, ধর্মভাব একতা, স্বদেশানুরাগ, আনন্দ ও সৌন্দর্য্য বোধ বৃদ্ধির চেষ্টা প্রভৃতি। তাঁর নানাবিধ কাজের মধ্যে এই ধরণের কাজকে তিনি যে কতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন, তার প্রমান তাঁর নিজের কথাই: "শিক্ষা সংস্কার এবং পল্লী সঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।"

"স্বদেশী সমাজ", "সমবায় নীতি", "পল্লী প্রকৃতি", "রাশিয়ার চিঠি" প্রভৃতি পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের ৩০ বছরের পল্লীসেবার যে সার সংকলিত হয়েছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, পল্লীসেবায় রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন সবসময় সমবায় প্রথার ওপর। তিনি চেয়েছিলেন সমবায় ঋণদান সমিতি ক্রয়-বিক্রয় সমিতি, দুগ্ধ উৎপাদন সমিতি, কৃষি উৎপাদন সমিতি প্রভৃতির সাহায্যে গ্রামবাসীদের জীবনে নূতন উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করতে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমবায় প্রথা কেবল ব্যক্তিগত উপার্জন পদ্ধতিকে একত্র করে কার্যকর আকারের উৎপাদন সংস্থা গঠনের পথই নয়, উল্টোদিক দিয়ে সমবায় বিকেন্দ্রীকরণেও সাহায্য করবে।

রাশিয়া রবীন্দ্রনাথকে রায়ত সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা ও ধারণাকে করে দিয়েছে দৃঢ়। সেখানে গিয়ে নিজের দেশের চাষীর দুঃখ যে তাকে বার বার ব্যথা দিয়েছে, তা ফুটে ওঠে তাঁর লেখায়: "আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে, আমি পারিনি বলে

দুঃখ হল।" "পারিনি" তিনি বলেছেন বড় বেদনায়। তাই বলে একদমই পারেননি, সে কথা মনে করা ঠিক নয়। তিনি যতটা আশা করেছিলেন, ততটা পারেননি ঠিকই। আর "দুঃখ"টা সেইখানেই। সেইজন্য তাঁর প্রত্যাশা পরবর্তী পুরুষদের কাছে। তিনি নিজে আশানুরূপ কাজ না করতে পারলেও প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করে গেছেন। সে পথে তিনি নিজেই কিছুদূর এগিয়েছিলেন। অনেকখানি রেখে গেছেন আমাদের জন্য। আমরা সে পথ পরিক্রমাও করেছি কিছু। কিন্তু আরো সর্তক হয়ে সঠিকভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টি দিয়ে চললে কবিগুরুর প্রত্যাশা পূরণে পারদর্শী হতে পারব বলে আশা রাখি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখি অত বড় বৈজ্ঞানিক হয়েও গবেষণাগারের বাইরে বেরিয়ে এসে দেশবাসীকে দেশাত্মবোধ ও ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত গেছেন। গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মিশে তাদেরই একজন হয়ে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথা কি বলব! তিনি তো সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন দীন দুঃখীদের কল্যাণের জন্য। যাদের শ্রম আমাদের অন্ন দিচ্ছে, সেইসব অবহেলিত অনাদৃতদের চোখ খুলে দেবার জন্য, তাদের উন্নতি করার জন্য তাঁর কি উদাত্ত আহ্বান! অতি উচ্চ আদর্শ নিয়ে দরিদ্র নরনারায়ণের জাগরণের জন্য কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে, বিশেষভাবে যুবশক্তিকে, কত আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের "পল্লীমঙ্গল" বিভাগ বিভিন্ন পল্লী-উন্নয়নমূলক কর্মে নিষ্ঠার সঙ্গে নিরত।

স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে দেখলাম সুদূর আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসে গ্রাম প্রধান ভারতবর্ষের জন্য সর্বস্ব নিবেদন করতে। আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষ দুর্দশায় দারুণ দুঃখিত হয়ে তিনি ব্যাকুল হয়ে মুক্তির পথ খুঁজেছেন। তিনি আহার-নিদ্রা ভুলে পায়ে হেঁটে বন্যার জল ভেঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে গ্রামবাসীদের আসল অবস্থার খবর, জনসাধারণকে জানাবার জন্য, সব জোগাড় করতেন। দারিদ্রের দারুণ হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে নিবেদিতা নিজের অসচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও উদার ভাবে দান করেছেন। দারুণ দুরারোগ্য রোগগ্রস্থ মানুষকে মৃত্যুর

মুখ থেকে বাঁচাতে নিজের অমূল্য জীবন অগ্রাহ্য করে কত সুন্দর সেবা করে গেছেন তিনি। সে সব কথা ভোলার নয়। দেশের নারীজাতিকেও তাঁর উন্নয়নমূলক কাজকর্মের অংশীদার করতে কত কষ্ট স্বীকার করেছেন তিনি। স্ত্রীশিক্ষা সম্প্রসারণ ছাড়া ভারতের ভবিষ্যত উন্নতি অসম্ভব বুঝে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নারীশিক্ষা প্রচলনে সচেষ্ট হন। সে কথা সকলেরই প্রায় জানা।

গান্ধীজী জাতির জনক। তিনি সমগ্র জাতিকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। সত্যনিষ্ঠ বিকেন্দ্রীকৃত আর্থিক নীতিতে কাজকর্মের মাধ্যমে গ্রামভারতের বিকাশের বহু চেষ্টা করেছেন তিনি। দেশে ফেরার আগেই দক্ষিণ আফ্রিকায়, তিনি তাঁর সত্য ও অহিংসার পথের পাশ্চাত্য গুরুর নামানুসারে "টলস্টয় ফার্ম" নামক আশ্রমটি স্থাপন করে গঠনমূলক কাজে উদ্যোগ নেন। দেশে এসে সবরমতী ও সেবাগ্রাম আশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁর গ্রামোন্নয়ন চিন্তা ও কর্ম প্রসারিত হতে থাকে। দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগিয়ে তুলে চরিত্রবান কর্মীদলের মাধ্যমে কুটিরশিল্প প্রচলন, দেশের ভূমি ও গো-সম্পদের সমবায় প্রথায় সদ্ব্যবহার প্রভৃতি করে, আমাদের অসংখ্য গ্রামগুলিকে প্রাণবান করে সর্বোদয় সমাজ সংগঠনে সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি।

অমর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চমকে দিয়েছেন তাঁর তীক্ষ্ণ কলমের খোঁচায় আমাদের পল্লী সমাজের অত্যাচারী অমানুষদের। বুকে বল দিয়েছেন অসংখ্য অবহেলিত অপমানিত অনাদৃত গ্রামবাসীদের। বিদ্রোহী কবি নজরুলের গলা গর্জে গিয়ে গায় লাঙ্গল উঁচিয়ে সাম্যের গান। সবশেষে সেই গানেরই তো রেশ নিয়ে চলে এলাম আমরা।

সুতরাং ঘড়ির কাঁটা মেলাবার মতো আমাদের বর্তমান গ্রামোন্নয়ন-মূলক কাজকর্মের মধ্যে মাঝে মাঝেই মনোযোগ দিয়ে দেখা দরকার ঐ সব মনীষীদের মনন এবং কর্ম। আর সেইমতো আদর্শটিকে ঠিক রেখে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলে আশাপ্রদ ফল পেতে অসুবিধা বিশেষ হবে না। চাই শুধু একটু সহানুভূতি, সত্যনিষ্ঠা, সৎসাহস, সময়ানুবর্তিতা, সুস্থ সামাজিক চেতনা,

স্বার্থত্যাগ, স্বজনপোষণ বিরোধী মনোভাব, সাম্প্রদায়িকতা দলাদলি ও রাজনীতির উর্দ্ধে ওঠা। সর্বোপরি চাই গ্রামসেবার মানসিকতা। এগুলি বার বার নানা ভাবে নানা ভাবনা-চিন্তা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিখিয়ে গেছেন আমাদের মনীষীরা।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে: "Great men think alike." এই জন্য আমরা এই সমস্ত মহামনীষীদের জীবনের এই বিশেষ দিক পর্যালোচনা করে পাই মোটামুটি এই একই রকম শিক্ষাই। এটা ঠিকই যে, দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশের পার্থক্য কিছু থাকলেও মূল সুরে সাদৃশ্য সবসময়েই দেখা যায়। অতএব অনুরূপ গুণাবলীর আন্তরিক অনুশীলনে অবশ্যই আসবে আমাদের সাফল্য। আশাকরি আজ আমরা সকলে মিলে, বিশেষ করে যুবকরা, এখানে আলোচিত মনীষীদের মধ্যে, স্বামীজীর জন্মদিনকে "জাতীয় যুব দিবস" হিসেবে এবং রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্রের ১২৫ তম জন্ম-জয়ন্তী, পর পর পালন সূত্রে ও এই আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষে শান্তির পরম পূজারী মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ করে, শপথ নেব, নতুন উদ্যমে ঐসব গুণাবলী গ্রহণ করার।

এভাবে গরীব গ্রামবাসীদের সেবা করাকে শুধু ব্রতের মর্যাদা দিয়ে নয়, ধর্মের মর্যাদা দিয়ে, যিনি সর্বাব্যাপী হয়ে বিশ্বে বিরাজ করছেন মানুষেয় মধ্যে, সেই দেবতাকেই নিবেদন করতে হবে সেবা। এটাই প্রকৃষ্ট পথ পরম-সত্তাকে সেবা করার, কেননা অবহেলিত, অত্যাচারিত দীন-দরিদ্র মানুষের মধ্যেই তাঁর ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ। সুতরাং উপেক্ষিত পল্লবাসীর উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে পরম পুরুষকে উপাসনার পর্যায়ে পৌছানোর প্রচেষ্টাই হল আদর্শ সমাজ-সেবা। আমরা সেই ভাবে চেষ্টা করলেই আদর্শ সমাজসেবক হতে পারব। আর অবিশ্রান্ত আশীর্বাদ আমাদের ওপর যে বর্ষিত হবে, এই সব মনীষীদের অন্তরের অন্তঃস্থল হতে, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

॥ কুড়ি ॥

প্রয়োজনীয় পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা

পুস্তক

১। রামমোহন রচনাবলী—হরফ, কলকাতা।

২। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন, রূপা, কলকাতা।

৩। ভবতোষ দত্ত—অর্থনীতির পথে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

৪। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—বাঙালী লেখকের রায়তচিন্তা, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

৫। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।

৬। Susobhan Chandra Sarkar (ed)—Rammohan Roy on Indian Economy, Socio-economic Reseach Institute, calcutta.

৭। বঙ্কিম রচনাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড)—সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৮। প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিম সাহিত্য : সমাজ ও সাধনা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা।

৯। ভবতোষ দত্ত—চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

১০। রবীন্দ্র রচনাবলী (২৭+অচলিত সংগ্রহ ২খণ্ড)—বিশ্বভারতী, কলকাতা।

১১। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পিতৃস্মৃতি, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা।

১২। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী—শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

১৩। প্রমথনাথ বিশী—শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

১৪। ক্ষুদিরাম দাশ—সমাজ প্রগতি ও রবীন্দ্রনাথ, ইউ' এন. ধর, কলকাতা।

১৫। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ ও সাম্যচিন্তা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

১৬। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—তুই মনীষী, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

১৭। সুশীল কুমার মণ্ডল—বিশ্বভারতীর উৎসব, বুকহাউস, বোলপুর।

১৮। শচীনন্দন ঘোষাল—পল্লী উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ, রত্না বুক এজেন্সী, কলকাতা।

১৯। সত্যদাস চক্রবর্তী—শ্রীনিকেতনের গোড়ার কথা, সাহিত্য সমাজ, শ্রীনিকেতন।

২০। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ, কলকাতা।

২১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী (৪ খণ্ড) বিশ্বভারতী, কলকাতা।

২২। প্রমথ চৌধুরী—রায়তের কথা, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

২৩। চিত্রা দেব—অনালোচিত রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, মডার্ন কলাম, কলকাতা।

২৪। লক্ষ্মীশ্বর সিংহ—পশ্চিমবঙ্গের শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ [১৮৫৩-১৯৬৫], জয়শ্রীপ্রকাশন, কলকাতা।

২৫। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, রবীন্দ্রভারতী, কলকাতা।

২৬। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—টলষ্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

২৭। মনকুমার সেন—সবার পিছে সবার নীচে, আনন্দ ভবন, কলকাতা।

২৮। সুধীরঞ্জন দাশ—আমাদের গুরুদেব, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

২৯। প্রবোধচন্দ্র সেন (সঃ)—রবীন্দ্রনাথ ঃ বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

৩০। প্রবোধচন্দ্র সেন—ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

৩১। প্রমদারঞ্জন ঘোষ—আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তি-নিকেতন, রীডার্স কর্ণার, কলকাতা।

৩২। উইলিয়াম পিয়ারসন—শান্তিনিকেতন স্মৃতি, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

৩৩। সোমেন্দ্রনাথ বসু—রবীন্দ্রনাথ ও রাশিয়ার চিঠি, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

৩৪। ডঃ শ্রীমন্তকুমার জানা—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা, ওরিয়েন্টাল বুক কোং, কলকাতা।

৩৫। ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার—আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ, অনিমা প্রকাশনী, কলকাতা।

৩৬। উমা দাশগুপ্ত—শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

৩৭। সুধীরচন্দ্র কর—কবিকথা, সুপ্রকাশন, কলকাতা।

৩৮। প্রণতি মুখোপাধ্যায়—শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

৩৯। সজনীকান্ত দাশ—রবীন্দ্রনাথ ঃ জীবন ও সাহিত্য, শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন, কলকাতা।

৪০। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র সমীক্ষা, এ.মুখার্জী, কলকাতা।

৪১। সুকুমার সেন—পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র বিকাশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

৪২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৪৩। শৈলেন চৌধুরী (স)—'তীর্থদর্শন'-এর পঞ্চাশ বছর, সোভিয়েত জাতিসংঘের দূতস্থানের বার্তাবিভাগ, কলকাতা।

৪৪। ডঃ দুলাল চৌধুরী—আমি তোমাদেরি লোক, পুস্তক বিপণি কলকাতা।

৪৫। নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৪৬। দেবীপদ ভট্টাচার্য (স)—রবীন্দ্রনাথ, ইস্টলাইট বুক হাউস, কলকাতা।

৪৭। অরবিন্দ পোদ্দার—রবীন্দ্রনাথ / শতবর্ষ পরে, ইণ্ডিয়ানা, কলকাতা।

৪৮। অমিতাভ চৌধুরী—জমিদার রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

৪৯। শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য—রবীন্দ্রমানস ও শিক্ষা, আনন্দ, কলকাতা।

৫০। চিত্তরঞ্জন দেব—শ্রীনিকেতন পরিচয়, বিচিত্রা, কলকতা।

৫১। Hiranmoy Banerjee—The House of The Tagores, Rabindra Bharati, Calcutta.

৫২। Gurdial Mallik—Gandhi & Tagore, Navajivan, Ahmedabad.

৫৩। R. K. Prabhu and Rabindra Kalekar (ed)—Truth Called them differently (Tagore-Gandhi controversy) Navaj van, Ahmedabad.

৫৪। Sasadhar Sinha—Social thinking of Rabindranath Tagore, Asia Publising House, Bobay.

৫৫। Sudhir Sen—Rabindranath Tagore on Rural Reconstruction, Visva-Barati, Calcutta.

৫৬। Dr Sachin Sen—The Political thoughgt of Tagore, General printers & publishers, Calcutta.

৫৭। Rathindranath Tagore—On the edges of Time, Orient Longman's, Calcutta.

৫৮। L. K. Elmhirst—Poet plowman, Visva-Bharati, Calcutta.

৫৯। Sugata Dasgupta—A poet a plan, Thrackers Spink, Calcutta.

৬০। Sugata Dasgupta—Social work & Social change, Porter sargent publisher, Massd.

৬১। P. C. Lal—Reconsvetin Education in Rural India, George Allen & Unwin, London.

৬২। Hiranmoy Banerjee—Experiments in Rural Reconstruction Visva-Bharati, Calcutta.

৬৩। BhupendranathSarkar—Tagore, the educator Academic publishers, Calcuttta.

৬৪। Santosh Chandra Sengupta (ed)—Rabindranath Tagore: Homage from Visva-Bharati, Santimiketan.

৬৫। রতনমণি চট্টোপাধ্যায় (স)—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা, ওরিয়েন্ট বুক কোং, কলকাতা।

৬৬। দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

৬৭। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ—মহৎ স্মৃতি, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

৬৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১০ খণ্ড) উদ্বোধন, কলকাতা।

৬৯। সুব্রত গুপ্ত—বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তা, মডার্ন কলাম, কলকাতা।

৭০। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রামসেবার স্মৃতিকথা, লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুর।

৭১। Santilal Mukherjee—Philosophy of Manmaking, New central Book Agency, Calcutta.

৭২। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ—স্বামীজীকে ধরে কাজে এগোও, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া।

৭৩। স্বামী গম্ভীরানন্দ—যুগনায়ক বিবেকানন্দ (৩ খণ্ড) উদ্বোধন, কলকাতা।

৭৪। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (স)—চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা।

৭৫। Swami Vireswarananda—Our duty towards motherland, Sri Ramkrishna Math, Madras.

৭৬। প্রণবেশ চক্রবর্তী—শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজ দর্শন, মডার্ণ কলাম, কলকাতা।

৭৭। নন্দলাল ভট্টাচার্য—অমৃতস্য পুত্রাঃ (২ খণ্ড) লিপিকা, কলকাতা।

৭৮। জীবন মুখোপাধ্যায়—স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ, কে. বি. প্রকাশনী, কলকাতা।

৭৯। ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বামী বীরেশ্বরানন্দের জীবনী ও বাণী, শৈব্যা, কলকাতা।

৮০। নিবেদিতা—স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, উদ্বোধন, কলকাতা।

৮১। নিবেদিতা—স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, উদ্বোধন, কলকাতা।

৮২। গোপাল হালদার (সঃ)—নিবেদিতা রচনা সংগ্রহ (১ম), বইপত্র, কলকাতা।

৮৩। সরলাবালা সরকার—নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি, নিবেদিতা স্কুল, কলকাতা।

৮৪। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।

৮৫। স্বামী তেজসানন্দ—ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন, কলকাতা।

৮৬। গান্ধী রচনা সম্ভার—গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি প. ব. সরকার, কলকাতা।

৮৭। অতুল্য ঘোষ—অহিংসা ও গান্ধী, কংগ্রেস ভবন, কলকাতা।

৮৮। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—গান্ধীজীর গঠনকর্ম, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

৮৯। প্রমথনাথ বিশী—গান্ধী জীবন ভাষ্য, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

৯০। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল—জীবনযোগী গান্ধীজী, প্রবর্তক পাবলিশার্স কলকাতা।

৯১। অম্লান দত্ত—গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ, কলকাতা।

৯২। Manoranjan Gupta—philosophy of co-operation, Orient Book Company, Calcutta.

৯৩। B. K. Sinha—Mahatma Gandhi & The co-operative movement, N. C. U. I, New Delhi.

৯৪। শরৎ রচনাবলী— শরৎ সমিতি, কলকাতা।

৯৫। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, কলকাতা।

৯৬। ডঃ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য—শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক, বর্ণ-পরিচয়, কলকাতা।

৯৭। অখণ্ড নজরুলগীতি—হরফ, কলকাতা।

৯৮। মুজফ্‌ফর আহমেদ—কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা।

৯৯। বিশ্বনাথ দে (স)—নজরুল স্মৃতি, সাহিত্যম, কলকাতা।

১০০। শান্তিকুমার মিত্র—দর্পনে বাংলা, আনন্দ, কলকাতা।

১০১। নিরঞ্জন হালদার—কৃষি ও সমবায়, রেনেসাঁস পাবলিশার্স, কলকাতা।

পত্র-পত্রিকা

১। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা
২। বিশ্বভারতী পত্রিকা
৩। ভাণ্ডার
৪। প্রবাসী
৫। বঙ্গদর্শন
৬। দেশ
৭। সমাজ শিক্ষা
৮। উদ্বোধন
৯। রবীন্দ্র ভাবনা
১০। ভূমিলক্ষ্মী
১১। বেতার জগৎ
১২। যুবমানস
১৩। পশ্চিমবঙ্গ
১৪। ভারত বিচিত্রা
১৫। জ্ঞান ও বিজ্ঞান
১৬। ধনধান্যে
১৭। ব্রতীবালক
১৮। শান্তিনিকেতন পত্রিকা
১৯। Visva-Bharati Bulletins
২০। Visva-Bharati Quarterly
২১। Community
২২। Modern Review
২৩। Tagore Studies
২৪। Kurukshetra
২৫। The Co-operatord
২৬। আজকাল
২৭। আনন্দবাজার পত্রিকা
২৮। যুগান্তর
২৯। পরিবর্তন
৩০। Visva-Bharati AnnualReports
৩১। Visva-Bharati News